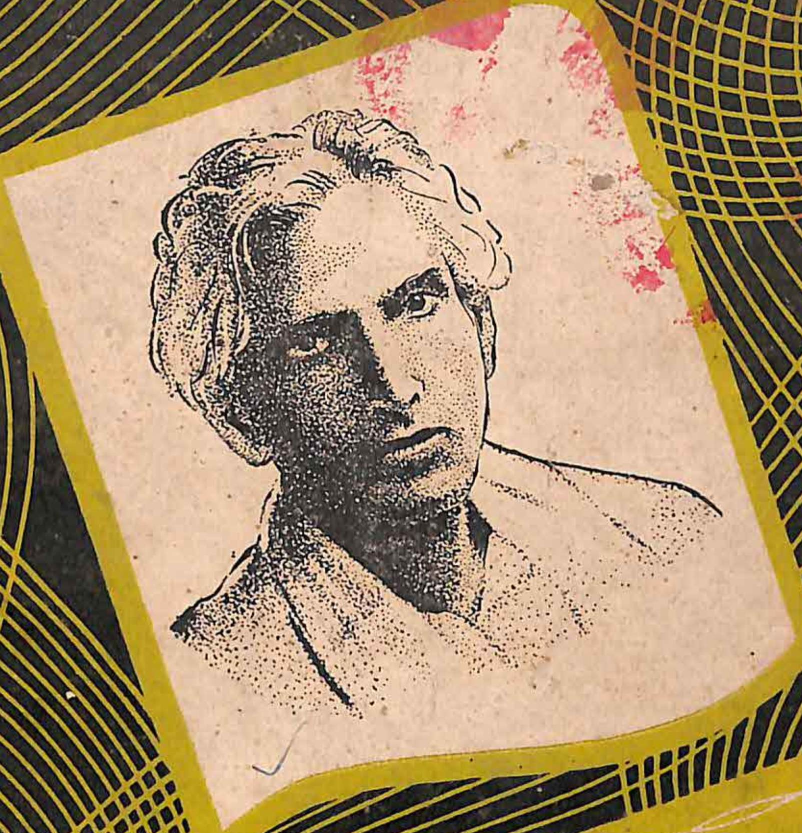


কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, মহাকবি মাইকেল, বাংলার শহীদ,
মহারাজ নন্দকুমার প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী

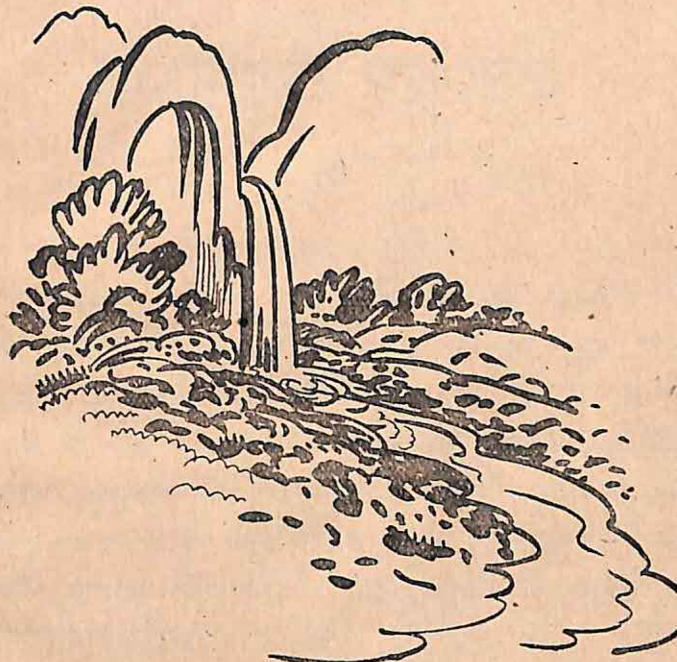
ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট : কলিকাতা—১২

প্রথম মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ : ১৩৫৭

দ্বিতীয় মুদ্রণ চৈত্র : ১৩৬০

দাম : এক টাকা

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত এবং ১৫এ, ক্ষুদিরাম বোস রোড, সাধারণ প্রেস লিঃ হইতে শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক মুদ্রিত।



কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র

এক

হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রাম।

বাংলা দেশের অন্যান্য গ্রাম যেমন হয়, এই গ্রামটিও ঠিক তেমনই। পাখী-ডাকা নিবিড় ছায়ায় ঢাকা গ্রামখানি, পুকুর ডোবা, সবই আছে এখানে। প্রভাতে যেমন নূতন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামখানি সোনার বর্ণে ঝলমল করিয়া উঠে, অপরাহ্ণে তেমনই সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে লাল আভায় সমস্ত গ্রামখানি রাঙাইয়া দেয়। রাখালের বাঁশের বাঁশীর মধুর ধ্বনিতে ও মধ্যাহ্নে উদাস ঘুঘুর স্বরে গ্রামখানি মুখরিত হইয়া উঠে। গ্রামের চারিদিকেই শ্যামল শস্য সুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত।

এই দেবানন্দপুরে এক ভরা বর্ষায় বাংলা ১২৮৩ সালের (ইংরেজী ১৮৭৬ সাল) ভাদ্র মাসে এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ বংশে একটি ছোট্ট শিশু ভূমিষ্ঠ হইল। ইনি আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র।

শরৎচন্দ্রের পিতার নাম বাবু মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, মাতার নাম ভুবনমোহিনী দেবী।

ভাইদের মধ্যে শরৎচন্দ্র ছিলেন সকলের বড়। তাঁহার এক বড় দিদি ছিলেন, তাঁহার নাম অনিলা দেবী। এই দিদির নামে শরৎচন্দ্র পরে কয়েকটি লেখা ছাপিয়া ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের পরের চারিটি ভাই অল্প বয়সেই মারা যান। পঞ্চম ভ্রাতা প্রভাসচন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বেদানন্দ নাম গ্রহণ করেন। তিনিও শরৎচন্দ্রের পূর্ব্বেই মারা যান। সকলের ছোট ভাইটির নাম প্রকাশচন্দ্র। একমাত্র তিনিই শরৎচন্দ্রের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটে ছিলেন। শরৎচন্দ্রের ভাই ভগিনীদিগের মধ্যে ছোট একটি বোন ছিলেন, তাঁহার নাম সুশীলা।

শরৎচন্দ্র তাঁহার ভাইবোনদিগকে বড়ই ভালবাসিতেন। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের মধুময় স্মৃতি ভুলিতে পারেন নাই। ভাই বোনদের ও আত্মীয় স্বজনদের জন্য সেই ব্যাকুলতা তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন তাঁহার সাহিত্যের অনেক স্থলে।

শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল বাবু তাঁহার মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তোমার নাতির নাম কি রাখিলে ?"

শরৎচন্দ্রের ঠাকুর মা উত্তর দিলেন, "ও জন্মিয়াছে ভাদ্র মাসে,—শরৎকালে, তাই ওর নাম থাকিবে শরৎচন্দ্র।"

শরৎচন্দ্র হইল বালকের পোষাকী নাম, কিন্তু তাঁহার ডাক নাম হইল ন্যাড়া। বাল্যে এই নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল বাবু ছিলেন অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির লোক। চড়া সুরেও কথা বলা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। ছেলে মেয়েদের মার-ধর করা দূরে থাকুক, তাহাদিগকে তিনি তিরস্কার করিতে পারিতেন না। নানা বিষয়ে তাঁহার পড়াশুনা ছিল বেশী। তিনি লিখিতেও পারিতেন। পুস্তক রচনায়ও তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি কোনটাই শেষ করিতে পারেন নাই। তিনি

ছবিও আঁকিতে পারিতেন। সময়ে সময়ে তিনি খেলিবার জন্য নানাপ্রকার খেলনা তৈরী করিয়া দিতেন। ঠিক যাহাকে শিল্পী বলা চলে, মতিলাল বাবু ছিলেন তাহাই। শরৎচন্দ্র পিতার এই গুণগুলির অধিকারী হইয়াছিলেন।

সংসার প্রতিপালনের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকা মতিবাবুর অভ্যাস ছিল না। তাঁহার সংসারটি নিতান্ত ছোট ছিল না। তাই সংসার চালাইবার জন্য তাঁহাকে চাকরী করিতে হইত বটে, কিন্তু কোথায়ও তিনি মন স্থির করিয়া বেশীদিন চাকরী করিতে পারিতেন না। চাকরী করা অপেক্ষা তিনি ন্যাড়াকে ডাকিয়া কাগজের ফুল কি নৌকা তৈরী করাই বেশী ভালবাসিতেন, নতুবা নীরবে বসিয়া পরিষ্কার খাতার পাতায় সুন্দর সুন্দর মুক্তার অক্ষরে নিজের মনে কবিতা বা গল্প লেখায় রত থাকিতেন। ভবিষ্যতে তিনি হয়ত একজন ভাল লেখক হইতে পারিতেন, কিন্তু সংসারের অভাবের তাড়নায় তাঁহাকে সর্ব্বদা অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইত বলিয়া তাঁহার ভাগ্যে সেই গৌরবলাভ ঘটিয়া উঠে নাই।

শরৎচন্দ্র তাঁহার পিতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"পিতার নিকট হইতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকারসূত্রে আর কিছুই পাই নাই। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া করিয়াছিল,—আমি অল্প বয়সেই সারা ভারতবর্ষ ঘুরিয়া আসিলাম। আর পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবন ভরিয়া আমি কেবল স্বপ্ন দেখিয়াই গেলাম। আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা—এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়াছিলেন, কিন্তু

কোনটাই তিনি শেষ করিতে পারেন নাই। তাঁহার লেখাগুলি আজ আমার কাছে নাই,—কবে কিরূপে হারাইয়া গিয়াছে, আজ সেই কথাও মনে নাই। কিন্তু এখনও স্পষ্ট মনে আছে, ছোট বেলায় কতবার তাঁহার অসমাপ্ত লেখাগুলি লইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিয়াছি। কেন তিনি এইগুলি শেষ করিয়া যান নাই,—এই বলিয়া কত দুঃখই না করিয়াছি। অসমাপ্ত অংশগুলি কি হইতে পারে তাহা ভাবিতে ভাবিতে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কাটিয়া গিয়াছে। এই কারণেই বোধ হয় আমি সতর বৎসরে গল্প লিখিতে আরম্ভ করি…।”

উপরের কথাগুলি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, শরৎচন্দ্র তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা পিতার নিকট হইতেই পাইয়াছিলেন।

দুই

ন্যাড়া দিন দিন বড় হইতে লাগিলেন।

সাধারণ গৃহস্থ ঘরের ছেলের মতই নানা সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া শরৎচন্দ্র বড় হইয়া উঠিলেন। ঠাকুরমা, মা, বাবা এবং দিদির স্নেহে শরৎচন্দ্রের শৈশবের দিনগুলি কাটিয়া যায়।

মাতাপিতা দেখিলেন, এখন ন্যাড়া বড় হইয়াছে। আর সর্ব্বক্ষণ তাঁহার খেলা ধূলায় কাটাইবার সময় নাই। এখন তাঁহার হাতে খড়ি দিয়া লেখাপড়া আরম্ভ করা দরকার।

শুভদিন দেখিয়া ন্যাড়ার হাতেখড়ি হইয়া গেল।

বাড়ীতেই তাঁহার প্রথম অক্ষর পরিচয় আরম্ভ হইল। পিতার কাছে মাদুর পাতিয়া বসিয়া তিনি অ, আ, ক, খ, লিখেন ও পড়েন। সন্ধ্যায় প্রদীপের ক্ষীণালোকে ঠাকুরমার কোলে মাথা রাখিয়া রামায়ণ মহাভারতের গল্প শোনেন। তখন কত রঙীন কল্পনায় তাঁহার কচি মন রাঙা হইয়া উঠে। তিনি কত কি ভাবিতে থাকেন। ভাবিতে ভাবিতে কল্পনার সমুদ্রে তলাইয়া যান।

দশ বৎসর বয়সের সময় শরৎচন্দ্রকে পেয়ারী পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। এইরূপ বদ্ধ জীবন কিন্তু শরৎচন্দ্রের মনঃপূত হইল না। একটা বাঁধাবাঁধি নিয়মের মধ্যে থাকিয়া পড়া মুখস্থ করা, পড়া দেওয়া ও লেখা এবং পড়া না পারিলে পণ্ডিত মহাশয়ের বেত খাওয়া শরৎচন্দ্রের বড়ই অসহ্য লাগিতে লাগিল।

বাড়ীতে যে লুকাইয়া থাকিবেন সে উপায়ও নাই। মা, ঠাকুরমা, দিদি প্রভৃতির চোখে ধরা পড়িয়া যাইতেন।

শরৎচন্দ্র এইবার পাঠশালা-পলায়নের ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। তাঁহার কয়েকজন সহপাঠী এই ষড়যন্ত্রে যোগদান করিল। অবশেষে শরৎচন্দ্র সত্য সত্যই পাঠশালা হইতে পলায়ন আরম্ভ করিলেন। কাহারও বাঁশবনে, কাহারও আমবাগানে, কাহারও পুকুরের ধারে, তাহাদের সময় কাটিতে লাগিল।

কাহার বাগানের আম ভাল, কাহার বাগানের পেয়ারাগুলি বেশ ভাল পাকিয়াছে, কাহার গাছে বেশ ভাল কুল ফলিয়াছে, কাহার পুকুরে মাছ ধরার বেশ সুবিধা আছে,—এই সব পরামর্শ চলিত তাহাদের মধ্যে। সঙ্গীরা শরৎচন্দ্রকে এই সব সন্ধান আনিয়া দিত। তারপর শরৎচন্দ্রের নেতৃত্বে আরম্ভ হইত কার্য্যসাধন।

নানা দুষ্কার্য্যের মধ্যে মাছ ধরার নেশা ছিল শরৎচন্দ্রের একটা বড় বাতিক। তিনি নিজেই বলিয়াছেন,—

"ছেলেবেলায় আমার মাছ ধরার বাতিক ছিল খুব বেশী। অবশ্য মস্ত ব্যাপার নয়, পুঁটি, চ্যালা প্রভৃতি ছোট ছোট মাছ। ভোর না হইতেই ছিপ হাতে নদীতে যাইয়া হাজির হইতাম। আমাদের গ্রামের প্রান্তে হাজা-মজা ক্ষুদ্র নদী। কোথায়ও এক কোমরের বেশী জল নাই,—সমস্তই শৈবালে আচ্ছন্ন, তাহার মাঝে মাঝে যেখানে একটু ফাঁক, সেইখানেই সব ছোট ছোট মাছ খেলা করিয়া বেড়াইত। বঁড়শীতে টোপ গাঁথিয়া সেইগুলি ধরায় ছিল আমার সব চাইতে বড় আনন্দ।

পাঠশালায় পড়িবার সময় একটি মেয়ে ছিল শরৎচন্দ্রের খেলার সাথী। এই মেয়েটি পাঠশালায় শরৎচন্দ্রের সহিত একত্র পড়িত। মেয়েটির উপর শরৎচন্দ্র দৌরাত্ম্যও কম করিতেন না। কোনও

দুষ্কার্য্যে যদি মেয়েটি কোনওদিন শরৎচন্দ্রকে সাহায্য না করিত, তবে শরৎচন্দ্র তাঁহাকে মার ধর করিতেও ছাড়িতেন না। অথচ তিনি তাহাকে সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসিতেন। এই মেয়েটি সঙ্গে না থাকিলে কোন কার্য্যই ভাল জমিত না। এই মেয়েটি শরৎচন্দ্রের জীবনে এমন একটা গভীর ছাপ রাখিয়া গিয়াছে যে শরৎ-সাহিত্যের সঙ্গে তাহার স্মৃতি নানাভাবে বিজড়িত রহিয়াছে।

শৈশব হইতে শরৎচন্দ্র পিতার যেমন অত্যন্ত বাধ্য ও প্রিয় সন্তান ছিলেন, ঠিক তেমনই অবাধ্য এবং বিরক্তির পাত্র ছিলেন প্রতিবাসীদের। তাঁহার অত্যাচারে যেমন প্রতিবাসীরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিত, তেমনই পেয়ারী পণ্ডিতও অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেন। শরৎচন্দ্র রোজই একটা না একটা অঘটন ঘটাইয়া বাড়ী ফিরিতেন। লোকেরা আসিয়া শরৎচন্দ্রের জননীর নিকট অভিযোগ জানাইতেন। মা পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেন। তাঁহার বড় আশা ছিল,—ন্যাড়া মানুষ হয়, ভদ্র হয়, বিদ্বান হয়; কিন্তু তাঁহার আচার আচরণ দেখিয়া মাকে হতাশ হইতে হইয়াছিল। ছেলেটার পড়াশুনায় মন নাই।—খালি খালি খেলা আর খেলা।

সময়ে সময়ে তিনি মনের দুঃখে শরৎচন্দ্রকে বলিতেন, "ন্যাড়া, তুই কি মানুষ হবি না? দুষ্টুমি আর খেলাধূলা ছাড়িয়া লেখা-পড়ায় মন দিবি না?"

ন্যাড়া তাহার ছোট মাথাটি নাড়িয়া জবাব দিত,—"নাঃ।" তারপর হাসিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিত।

মা বলিতেন, "লোকে যে তোকে মূর্খ বলিবে।"

ন্যাড়া তাচ্ছিল্যের সুরে উত্তর দিত, বলুক।

মা ইহাতে মনে বড়ই ব্যথা পাইতেন বটে, কিন্তু পুত্রকে এই জন্য বকা-ঝকা করিতে পারিতেন না। তাঁহার হৃদয়টি ছিল বড় কোমল। পাড়া প্রতিবাসীদিগকে তিনি বড়ই স্নেহ ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। এমন কি, বাড়ীর গৃহপালিত পশুপক্ষগুলির প্রতিও তাঁহার আদর যত্ন ছিল অপরিমেয়। শরৎচন্দ্রও মায়ের এই সব সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন।

অতি শৈশবেও শরৎচন্দ্রের মন কত কোমলতায় ভরা ছিল তাহার একটা গল্প বলি শোন।

একদিন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে বালক শরৎচন্দ্র বাড়ীতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাগানে বাহির হইয়াছেন ফড়িং ধরিতে। হাতে তাঁহার একটি ছোট্ট বাক্স।

শরৎচন্দ্র খুব সাবধানে বাগানের গাছ-পালার মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক মনে ফড়িং ধরিয়া ধরিয়া বাক্সে রাখিতেছেন। এদিকে বেলা বাড়িয়া চলিল, সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য নাই।

ঘুরিতে ঘুরিতে শরৎচন্দ্র এক স্থানে আসিয়া থামিলেন। গাছের পাতার উপর বড় একটি সুন্দর ফড়িং বসিয়া আছে। চমৎকার রঙীন ফড়িংটি। তাকাইয়া দেখিতে দেখিতে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ফড়িংটা ধরিতেই হইবে।

পা টিপিয়া যাইয়া তিনি ফড়িংটা ঠিক ধরিয়া ফেলিলেন, কিন্তু ধরা মাত্রই ফড়িংটার একটা ডানা ভাঙ্গিয়া গেল। ইহা দেখিয়া শরৎচন্দ্রের মন বড়ই খারাপ হইয়া গেল। তিনি বাগানের ভিজা ঘাসের উপরে বসিয়াই ফড়িংটার ডানা সারাইববার কাজে লাগিয়া

গেলেন। কিন্তু ফড়িংএর ডানা আর সারিল না ; ক্রমেই ফড়িংটা নির্জ্জীব হইয়া পড়িতে লাগিল।

এইরূপে কতকটা সময় চলিয়া গেল। শরৎচন্দ্র অর্দ্ধমৃত ফড়িংটা হাতে লইয়াই বসিয়া আছেন। তাঁহার চোখে মুখে বিষাদের চিহ্ন।

এমন সময়ে তাঁহার পিতা তাঁহাকে খুঁজিতে আসিয়া দেখেন, একটু দূরে ছেলে বিষণ্ণ মুখে বসিয়া আছেন, তাঁহার হাতে একটি অর্দ্ধমৃত ফড়িং।

পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি হইয়াছে রে ?"

শরৎচন্দ্র মুখে কিছু না বলিয়া ফড়িংশুদ্ধ হাতখানা তাঁহার সম্মুখে বাড়াইয়া দিলেন। পিতা দেখিয়াই ব্যাপারটা সমস্ত বুঝিয়া লইলেন। ছেলের হাত হইতে ফড়িংটা লইয়া এক পাশে ঘাসের উপর রাখিয়া দিয়া বলিলেন,—"আয় চলে আয়। ও আপনিই সেরে যাবে। ভগবান ওকে সারিয়ে দেবেন।"

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঠিক ?"

পিতা বলিলেন,—"হ্যাঁ,ঠিক। কাল আসিয়া দেখিস্।"

শরৎচন্দ্রের মন বেদনায় ভরিয়া উঠিল। তিনি করুণ দৃষ্টিতে ফড়িংটার দিকে চাহিতে চাহিতে পিতার সঙ্গে বাড়ীর দিকে চলিলেন। যাইতে যাইতে তাঁহার মনে কি হইল, তিনি তাঁহার ছোট বাক্সটি খুলিয়া সমস্ত ফড়িং উড়াইয়া দিলেন।

শরৎচন্দ্রের মন ছিল এতই কোমল, এতই দরদে ভরা !

তিন

শরৎচন্দ্রের বয়স তখন বার বৎসর হইবে।

এক ছুটির দিনে সকালে ঘরের মধ্যে বসিয়া ঘুড়ি তৈরী করিতেছিলেন। এমন সময় শুনিতে পাইলেন, পাড়ার নয়ন বাগ্‌দী আসিয়া তাঁহার ঠাকুরমার কাছে পাঁচটি টাকা ধার চাহিতেছে, সে বসন্তপুর হইতে গরু কিনিয়া আনিবে।

বসন্তপুরের নাম শুনিয়াই তাঁহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। বসন্তপুরে বঁড়শীর ভাল ছিপ পাওয়া যায়। যাহাদের ছিপে মাছ ধরার বাতিক, ভাল ছিপ যোগাড় করিবার সখও তাহাদের কম নাই। বসন্তপুর হইতে ভাল ছিপ আনার জন্য শরৎচন্দ্রের হৃদয় আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল।

শরৎচন্দ্রের ঠাকুরমা নয়নকে টাকা দিলেন। নয়ন টাকা লইয়া চলিয়া গেল। শরৎচন্দ্র কখন যে তাহার পিছু লইলেন তাহা সে কিছুই টের পাইল না। গ্রাণ্ড্ট্রাঙ্ক রোড ধরিরা প্রায় এক মাইলের বেশী পথ যাওয়ার পর নয়ন পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিতে পাইল, শরৎচন্দ্র তাহার পিছনে পিছনে আসিতেছেন।

শরৎচন্দ্রকে দেখিয়া নয়ন ভয়ানক রাগ করিয়া বলিল, "তুমি দাদাবাবু, বাড়ী ফিরিয়া যাও, ঠাকুরমা, মা ভয়ানক রাগ করিবেন; তোমার জন্য আমি ভাল দেখিয়া দশখানা ছিপ লইয়া আসিব।"

শরৎচন্দ্র কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সম্মত নহেন। অনেক বলা কহাতেও যখন নয়ন শরৎচন্দ্রকে বাড়ী ফিরিতে রাজী করাইতে পারিল না, তখন সে জোর করিয়া তাঁহাকে বাড়ীতে লইয়া আসিল।

ঠাকুরমা সব কথা শুনিয়া, শরৎচন্দ্রকে খুব বকিয়া দিলেন। কিছুতেই তাঁহার বসন্তপুরে যাওয়া হইতে পারে না। শরৎচন্দ্র কোনও কথা বলিলেন না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। বসিয়া বসিয়া মনে মনে এক ফন্দী আঁটিলেন।

কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া তেল মাখিয়া স্নানের ভান করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু পুকুরে না গিয়া গ্রামের মেঠো পথ ধরিয়া বসন্তপুরের দিকে চলিলেন। তারপর গ্রামের কাঁচা পথটা যেখানে আসিয়া পাকা রাস্তায় মিশিয়াছে, সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

একটু পরে নয়ন আসিল। সে শরৎচন্দ্রকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। শরৎচন্দ্র কিরূপ ফন্দী করিয়া বাড়ী হইতে পলাইয়া আসিয়াছেন সেই গল্প বলিলেন। নয়ন বাগ্‌দী হাসিয়া বলিল,—"চল ঠাকুর, যাহা বরাতে আছে হইবে।"

বসন্তপুরে আসিয়া গরু কিনিয়া বাড়ী ফিরিতে রাত্রি হইয়া গেল। দুই পাশে ঘন বন, তাহার মধ্য দিয়া পথ। সেই পথে নয়ন আর শরৎচন্দ্র বাড়ী ফিরিতেছেন।

কিছুদূরে আসার পরই তাহারা ভয়ানক করুণ চীৎকার শুনিতে পাইলেন, "বাবারে, মেরে ফেল্লেরে, রক্ষা কর, কে কোথায় আছ?" তারপরই লাঠির দুমাদুম্ দপাদপ্ শব্দ। তাহার পরই সব নীরব, স্থির।

নয়ন বলিল,—"একটা মানুষ।"

—শুনিয়া শরৎচন্দ্রের বুক ভয়ে দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার পা যেন আর চলিতেছিল না।

ধীরে ধীরে আবার তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অন্ধকারের মধ্যেই দেখা গেল, পাঁচ-ছয় জন লোক দৌড়াইয়া পাকুড় গাছের তলায় যাইয়া লুকাইল।

আরও একটু আগাইয়া গিয়া দেখিতে পাইলেন, একজন ভিখারী বোষ্টমকে ঠ্যাঙাড়ের দল মারিয়া ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

ঠ্যাঙাড়ে কি জান? ইহারা এক প্রকার দস্যু। এখন আর ইহাদের উপদ্রব নাই, কিন্তু ষাট-সত্তর বৎসর পূর্ব্বে ইহাদের উপদ্রব ছিল খুবই। যে সব নির্জ্জন মাঠের ও বনের পথে লোক যাতায়াত করিত, সেই সমস্ত পথে ছিল এই ঠ্যাঙাড়ে দলের আড্ডা। পথিক-দিগকে আক্রমণ করিবারও ইহাদের একটা স্বতন্ত্র পদ্ধতি ছিল। কাঁচা বাঁশের ছোট ছোট খেঁটে থাকিত ইহাদের সঙ্গে। অন্ধকার হইতে লুক্কায়িত অবস্থায় ইহারা পথিকের পা লক্ষ্য করিয়া সেই বাঁশের খেঁটে ছুঁড়িয়া মারিত। পায়ে আঘাত লাগিয়া পথিক পথের উপর পড়িয়া যাইত। তখন ঠ্যাঙাড়ের দল ছুটিয়া আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিত এবং পথিকের উপর লাঠি-পেটা সুরু করিয়া দিত। পথিকের মৃত্যু হইলে ইহারা তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করিত।

একজন নিরীহ ভিখারী বোষ্টমকে এইরূপে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করায় নয়নের ভারী রাগ হইল। সে ঠিক করিল, ঠ্যাঙাড়ের দলকে সে ইহার প্রতিফল প্রদান করিবে। নয়ন একজন বিখ্যাত লাঠিয়াল। এইজন্য দেশে তাহার বেশ খ্যাতি আছে। সে শরৎচন্দ্রকে বলিল,—"দাদা ভাই, তুমি গরুটাকে ধ'রে একটু এইখানে দাঁড়িয়ে থাক ত, আমি ঠ্যাঙাড়েদের একটু শিক্ষা দিয়ে আসি।"

ঠ্যাঙাড়েদের শিক্ষা দেওয়ার কথা শুনিয়া বালক শরৎচন্দ্রের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তিনি বিশেষ উৎসাহ সহকারে বলিলেন,—"খুব পারবো। তুমি এক্ষুণি যাও। তুমি বেশ ক'রে এক ব্যাটাকে ধ'রে থাকবে, আর আমি ঠ্যাঙ্গাবো।"

নয়ন একটা খেঁটো হাতে করিয়া অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়া আগাইয়া চলিল। শরৎচন্দ্র গরুর দড়ি ধরিয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

একটু পরে কতকগুলি লোকের ছুটাছুটি ও চীৎকারের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। শরৎচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন, কেহ হয়ত নয়নের হাতে ধরা পড়িয়াছে।

নয়ন চীৎকার করিয়া বলিল,—"এক ব্যাটাকে ধরেছি, দাদা ভাই!"

শরৎচন্দ্র আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"এইখানে ধ'রে নিয়ে এস, আমি নিজ হাতে ঠেঙিয়ে মারবো, তুমি মেরে ফেলনা যেন।"

একটু পরেই নয়ন একটা লোককে ধরিয়া টানিতে টানিতে সেইখানে আনিয়া হাজির করিল। লোকটার মুখে কালি মাখানো, আর চুণের ফোঁটা দেওয়া। সে হাউমাউ করিয়া কাঁদিতেছিল।

দেখিয়া শরৎচন্দ্র ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন।

নয়ন প্রথমেই তাহাকে রীতিমত প্রহার করিয়া শরৎচন্দ্রকে বলিল,—"নাও, দাদাভাই! এইবার তুমি ঠেঙাও।"

লোকটা তখন অর্দ্ধমৃত অবস্থায় গোঙাইতেছিল। দেখিয়া শরৎচন্দ্রের বড় ভয় হইল। তিনি বলিলেন,—"আমি পারবো না নয়ন দা।"

নয়ন বলিল,—"পারবে না তুমি? তবে আমিই শেষ ক'রে দিই।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন,—"না, নয়ন দা, আর মেরো না। এইবার ওকে ছেড়ে দাও।"

তাহার পর তাঁহারা লোকটাকে ছাড়িয়া দিয়া বাড়ীর পথে চলিলেন।

বাড়ীতে আসিয়া শরৎচন্দ্র ঠাকুরমায়ের কাছে ঠ্যাঙাড়ে মারার গল্প বলিলেন। ঠাকুর মা শুনিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। শরৎচন্দ্র যে নিরাপদে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছেন, এই জন্য ঠাকুর দেবতার চরণে সহস্র সহস্র প্রণতি জানাইতে লাগিলেন।

চার

শরৎচন্দ্র নিজের মুখেই তাঁহার শৈশবের কাহিনী বলিয়াছেন—

"ছেলেবেলার কথা মনে আছে; পাড়াগাঁয়ে মাছ ধরে, ডোঙা ঠেলে, নৌকা বেয়ে দিন কাটে, বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাক্‌রেদি করি, তার আনন্দ ও আরাম যখন পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে তখন গামছা কাঁধে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হই।……সেটা শেষ হ'লে আবার একদিন ক্ষত বিক্ষত পায়ে নির্জ্জীব দেহে ঘরে ফিরে আসি। আদর অভ্যর্থনার পালা শেষ হ'লে অভিভাবকেরা পুনরায় বিদ্যালয়ে চালান ক'রে দেন। সেখানে আর এক দফা অভ্যর্থনা লাভের পর আবার 'বোধোদয়' ও 'পদ্যপাঠে' মনোনিবেশ করি। আবার এক দিন প্রতিজ্ঞা ভুলি, আবার দুষ্ট সরস্বতী কাঁধে চাপে, আবার সাক্‌রেদি সুরু করি, আবার নিরুদ্দেশ যাত্রা, আবার ফিরে আসা, আবার তেমনি ক'রে তাদের আপ্যায়ন সম্বর্দ্ধনার ঘটা,—এমনি ক'রে 'বোধোদয়', 'পদ্যপাঠ' ও বাল্যজীবনের এক অধ্যায় শেষ হ'ল।"

পাঁচ

সহসা শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল বাবুকে সপরিবারে দেবানন্দপুর ছাড়িয়া ভাগলপুরে আসিতে হইল। এই ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের মামার বাড়ী। এখানকার শাসন দেবানন্দপুরের মত মুক্ত নহে। এই বাড়ীতে শাসনের বড় কড়াকড়ি। বাড়ীর ছেলেমেয়েদিগকে সর্ব্বদাই একটা কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্য দিয়া চলিতে হয়। দেবানন্দপুরের সহিত এখানকার নিয়ম-কানুন ও শাসনের যেন আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

মামা-বাড়ীর কঠোর শাসনের মধ্যে পড়িয়া শরৎচন্দ্রের মন যেন একেবারে হাঁপাইয়া উঠিল। তাঁহার অবস্থা ঠিক যেন খাঁচায়পোরা পাখীর মতন হইল। কোনও স্বাধীনতা খাটে না এখানে। ভোর বেলায় প্রত্যহ হাতমুখ ধুইয়া নিয়মিত পড়া অভ্যাস করা, তাহার পর স্কুলে যাওয়া। এই স্কুলের নিয়ম-কানুন ও শাসনও বড় কঠিন। দেবানন্দপুরের পেয়ারী পণ্ডিতের পাঠশালার মতন এই স্কুল নয়। শিক্ষকেরাও ভয়ঙ্কর কড়া। পড়ায় ফাঁকি দেওয়া বা স্কুল হইতে পলায়নের কোনও উপায় নাই এই বিদ্যালয়ে।

তারপর এই স্কুলে শরৎচন্দ্রের পড়াশুনা লইয়া এক মহা সমস্যা উপস্থিত হইল। শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুরে পড়াশুনা কিছুই করেন নাই। কিন্তু মাতুলরা সেই খবর না লইয়াই শরৎন্দ্রকে ছাত্রবৃত্তি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। এই স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া শরৎচন্দ্র পড়াশুনা লইয়াও বড়ই বিপদে পড়িলেন, কারণ গ্রাম্য পাঠশালায় শরৎচন্দ্র পড়াশুনা কিছুই করেন নাই। এখানকার

ছাত্রেরা সর্ব্ববিষয়েই তাঁহার অপেক্ষা বেশী অগ্রসর। সকল বিষয়েই শরৎচন্দ্র তাহাদের পশ্চাতে। কয়েকদিন স্কুলে যাওয়ার পরই তিনি এ বিষয়ে লক্ষ্য করিলেন। শৈশব হইতে তাঁহার চরিত্রে এই একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে, সমবয়সী বা সহপাঠী ইহাদের কাছে তিনি কোনও বিষয়ে পিছনে পড়িয়া থাকিবেন, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। ছাত্রবৃত্তি স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া শরৎচন্দ্র যখন দেখিলেন, পড়াশুনায় তিনি সহপাঠীদের সহিত পারিয়া উঠিতেছেন না, তখন তাঁর জেদ বাড়িয়া গেল,—যে প্রকারেই হউক ইহাদের সকলের উপরে থাকিতে হইবে। তখন হইতে তিনি পড়াশুনায় মন দিলেন। অল্প দিন মধ্যেই দেখা গেল, শরৎচন্দ্র পড়াশুনায় সকলের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। অল্পদিনের মধ্যেই ভাল ছেলে বলিয়া শরৎচন্দ্রের খ্যাতি রটিয়া গেল। কোনও কোনও বিষয়ে শরৎচন্দ্র ছেলেদের উপর কর্ত্তৃত্বও করিতে লাগিলেন।

ইংরেজী ১৮৯৭ সালে শরৎচন্দ্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। তাঁহার জীবনে একটা ঘোর পরিবর্ত্তন আসিল। এখন তিনি স্কুলের ভাল ছেলেদের মধ্যে একজন। পড়া-শুনায় তাঁহার গভীর মনোযোগ। প্রথম বৎসরেই বার্ষিক পরীক্ষায় যে তিনি কেবল প্রথম স্থান অধিকার করিলেন, তাহা নহে ; তিনি একেবারে ডবল প্রমোশন পাইলেন। তিনি এইবার লাইব্রেরী হইতে ভাল ভাল বই আনিয়া তাহা পড়িতে লাগিলেন।

তাই বলিয়া শরৎচন্দ্র খেলা-ধূলা ও দুষ্টামি যে একেবারেই ছাড়িয়া দিলেন, তাহা নহে। বরং খেলা-ধূলায় তাঁহার অনুরাগ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বৃদ্ধি পাইল। মার্ব্বেল খেলায় শরৎচন্দ্রের জুড়ী

পাওয়া যায় না, ঘুড়ীর প্যাঁচ খেলায় তিনি অদ্বিতীয়, গুলি খেলায় তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ ছিল না। সহপাঠীরা তাঁহাকে গুরুর মত শ্রদ্ধা করিত এবং বন্ধুর মত ভালবাসিত।

এই সময়ে শরীর চর্চ্চার দিকে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি পড়িল। যেমন এই বিষয় মনে উদয় হওয়া, অমনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে তিনি উদ্যোগী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মামাদের বাড়ীর উত্তর দিকে গঙ্গার ঠিক উপরে একটা প্রকাণ্ড পড়ো বাড়ী ছিল। লোকে ইহাকে বলিত, "ভূতের বাড়ী"। শরৎচন্দ্র এই বাড়ীতেই দলবল লইয়া একটা কুস্তির আখড়া তৈরী করিয়া ফেলিলেন। ছেলেরা সকাল বিকাল এখানে কুস্তির কসরৎ শিক্ষা করিত। কিন্তু সকলের মনেই একটা বড় অভাব অনুভূত হইল,—আখড়ায় কোনও প্যারালাল বার নাই। তাহা না থাকিলে যে আখড়া আখড়াই নয়, এই বিয়য়ে সকলেই একমত। কিন্তু প্যারালাল বার করিতে টাকার প্রয়োজন, ছেলেরা টাকা পাইবে কোথায়? অভিভাবকদিগের নিকটে যে টাকা চাহিবে, সে উপায়ও নাই। অনেক অভিভাবকই তখন ছিলেন কুস্তির আখড়ার নামে ভয়ানক চটা। তাঁহারা মনে করিতেন, কুস্তির আখড়ায় ছেলেরা কেবল গুণ্ডামী শিক্ষা করে। অতএব কুস্তির আখড়া সম্বন্ধে অর্থ সাহায্য চাওয়া হইবে শুধুমাত্র তিরস্কার লাভ করা। কিন্তু একটা প্যারালাল বার না হইলে যে কুস্তির আখড়া আখড়াই নয়।

একদিন বৈকালে কুস্তির শেষে ছেলের দল শরৎচন্দ্রকে ধরিয়া বসিল, তাহাদের আখড়ায় একটা প্যারালাল বার না করিলেই চলিবে না। শরৎচন্দ্র কিছুক্ষণ ভাবিয়া লইলেন, তাহার পর দা হাতে

কয়েকজন সঙ্গীকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। পরের দিন দেখা গেল, আখড়ায় একটা বাঁশের প্যারালাল বার পোঁতা হইয়া গিয়াছে। তখন ছেলেদের মনে কি উল্লাস ও স্ফূর্তি!

এই সমস্ত খেলা-ধূলার মধ্যেও শরৎচন্দ্র কোথায় উধাও হইয়া যাইতেন। বন্ধুবান্ধবেরা তাহা কিছুই জানিতে পারিত না। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলে শরৎচন্দ্র গম্ভীরভাবে উত্তর দিতেন, "তপোবনে।" কিন্তু এই তপোবন যে কোথায় এবং কিরূপ তাহা তিনি কাহাকেও বলিতেন না।

একদিন শরৎচন্দ্র খেয়ালের বশে তাঁহার এক মামাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন এই তপোবনে। এই মামাটির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ ভাব ছিল। ইঁহার নাম সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

সুরেন্দ্রনাথ এই তপোবনের একটা চমৎকার বর্ণনা লিখিয়াছেন।—

"ঘোষেদের সেই পড়ো বাড়ীর উত্তর দিকে একধারে গঙ্গার ঠিক উপরেই একটা ঘরের পিছনে কতকগুলি নিম আর কামরাঙা গাছ একটুখানি ছোট জায়গাকে অন্ধকারে নিবিড়ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। নিমের গুলঞ্চ, মদনের কাঁটালতা চারিদিক হইতে এই স্থানটিকে এমনভাবে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল যে, মানুষের পক্ষে তাহার মধ্যে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। শরৎচন্দ্র অতি সন্তর্পণে সেই লতার পর্দ্দা সরাইয়া ভিতরে গেলেন। ভিতরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এক টুকরা জায়গা। সবুজ লতাপাতার ফাঁক দিয়া সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণ তাহার মধ্যে একপ্রকার হরিতাভ আলোর সৃষ্টি করিয়াছে। দেখিয়া দুই চক্ষু জুড়াইয়া, মনটি শান্ত হইয়া পড়ে। তাহারই মধ্যে

এক পাশে ছিল একখানি বড় পাথর। তাহার উপর উঠিয়া বসিয়া শরৎচন্দ্র সঙ্গীকে ডাকিলেন,—"আয়!"

সঙ্গীটি সভয়-সম্ভ্রমে কাছে গিয়া বসিল। নীচে খরস্রোতা গঙ্গা বহিয়া চলিয়াছে। দূরে গঙ্গার ওপারের দৃশ্য পাতার ফাঁকে ফাঁকে অস্পষ্ট চোখে পড়ে। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস মৃদু হিল্লোলে সর্ব্বাঙ্গে সুকোমল একটি স্পর্শ দিয়া যাইতেছে! সঙ্গীটি মুগ্ধ হইয়া বলিলেন,—"জায়গাটি ভারী সুন্দর!"

শরৎচন্দ্র বলিলেন,—"এইখানে আসিয়া বসিয়া থাকিতে আমার বড় ভাল লাগে, বসিয়া বসিয়া কত কথাই যে ভাবি!"

সঙ্গী বলিলেন,—"সত্যই যেন তপোবনে আসিয়াছি।"

সেখান হইতে বাহির হইয়া শরৎচন্দ্র বলিলেন,—"কখনো যেন এখানে একা আসিস্ না; এখানে সাপ আছে।"

হয়ত পাছে অনেকে আসিয়া এই শান্তিপূর্ণ স্থানের শান্তি ভয় করে এইজন্যই শরৎচন্দ্র সাপের কথা বলিয়াছিলেন। যে রকম জঙ্গল আর যে রকম অন্ধকার, তাহাতে সেখানে সাপ থাকাও বিচিত্র নহে।

একবার শরৎচন্দ্রকে সাপে কামড়াইয়াছিল। সাপটা বিষাক্ত। অনেক কষ্টে সেবার তাঁহার প্রাণ রক্ষা পায়। ইহার পর হইতেই সাপের উপর তিনি ভয়ানক জাতক্রোধ হইয়া পড়েন। সাপ ধরা এবং সাপ মারা তাঁহার একটা বড়ই উৎসাহের কার্য্য হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার মামার বাড়ীতে 'সংসার কোষ' নামে একখানা পুরাতন পুস্তক ছিল। তাহাতে সাপ ধরার একটা কৌশল লেখা ছিল।—বেলের শিকড় সাপের মুখের কাছে ধরিলে, যত বিষাক্ত সাপই হউক, সে মাথা নীচু করিয়া মড়ার মত পড়িয়া থাকিবে।

এই উপায়ে সাপ ধরিবার জন্য শরৎচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি একটা বেলের শিকড় যোগাড় করিয়া আনিলেন। তারপর আরম্ভ হইল সাপ খুঁজিয়া বাহির করা। খুঁজিতে খুঁজিতে বাড়ীর এক কোণে একটা গাছের গোড়ায় গাদা করা পুরাতন ইটের মধ্য হইতে একটা গোখুরা সাপের বাচ্চা বাহির হইল। সকলের খোঁচাখুঁচিতে বাচ্চাটা ফণা তুলিয়া তাড়া করিয়া আসিল। শরৎচন্দ্র তখন তাড়াতাড়ি তাহার ফণার কাছে বেলের শিকড় ধরিলেন। সাপটা তখন নিৰ্জ্জীব হইয়া পড়া দূরে থাকুক, বেলের শিকড়ের উপরেই ক্রমাগত ছোবল মারিতে লাগিল। সাপ দমিল না দেখিয়া ছেলের দল লাঠিপেঠা করিয়া তাহাকে শেষ করিয়া ফেলিল।

ছয়

শরৎচন্দ্রের মাতুল-পরিবারে পারিবারিক গোলমাল উপস্থিত হওয়ায় মতিবাবু রাগ করিয়া সপরিবারে ভাগলপুর হইতে আবার দেবানন্দপুরে চলিয়া আসিলেন। কাজেই শরৎচন্দ্রকেও আবার দেবানন্দপুরে ফিরিয়া আসিতে হইল।

শরৎচন্দ্র তাঁহার ভাগলপুরের জীবন সম্বন্ধে নিজমুখে যাহা বলিয়াছেন তাহা শোন। ইহা পড়িয়া তোমরা বুঝিতে পারিবে কিরূপে শরৎচন্দ্র সাহিত্য রচনার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন।—

"……এলাম শহরে, একমাত্র বোধোদয়ের নজিরে গুরুজনেরা ভর্ত্তি ক'রে দিলেন ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে। পাঠ্য—সীতার বনবাস, চারুপাঠ, সদ্ভাবশতক ও মোটা ব্যাকরণ। এ শুধু পড়ে যাওয়া নয়,……এ পণ্ডিতের কাছে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরীক্ষা দেওয়া। সুতরাং অসঙ্কোচে বলা চলে যে, সাহিত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটলো চোখের জলে। তারপরে বহু দুঃখে সে মিয়াদও কাটলো। তখন ধারণা ছিল না যে, মানুষকে দুঃখ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোন উদ্দেশ্য আছে।

যে পরিবারে আমি মানুষ, সেখানে কাব্য, উপন্যাস দুর্নীতির নামান্তর, সঙ্গীত অস্পৃশ্য, সেখানে সবাই চায় পাস করতে এবং উকীল হ'তে, এরি মাঝখানে আমার দিন কেটে চলে। কিন্তু হঠাৎ একদিন এর মাঝেও বিপর্য্যয় ঘটলো। আমার এক আত্মীয় তখন বিদেশে থেকে কলেজে পড়তেন, তিনি এলেন বাড়ী। তাঁর ছিল সঙ্গীতে অনুরাগ, কাব্যে আসক্তি, বাড়ীর সব মেয়েদের জড় ক'রে তিনি একদিন পড়ে শোনালেন রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'। কে কতটা বুঝলো জানিনে, কিন্তু যিনি পড়ছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার চোখেও জল এলো। কিন্তু পাছে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, এই লজ্জায়

তাড়াতাড়ি বাইরে চ'লে এলাম। কিন্তু কাব্যের সঙ্গে দ্বিতীয়বার পরিচয় ঘটলো এবং বেশ মনে পড়ে, এইবার পেলাম তার সত্য পরিচয়। এর পর এ বাড়ীর উকীল হবার কঠোর নিয়ম-সংযম আর ধাতে সইলো না। আবার ফিরতে হ'লো আমাদের সেই পুরাণো পল্লী-ভবনে।......"

দেবানন্দপুরের 'ন্যাড়া' আবার ফিরিয়া আসিলেন দেবানন্দপুরে। সেই পুরাতন শ্যামছায়াপূর্ণ নিবিড় পল্লী-ভবন, সেই পুরাতন খেলার সাথীদের দল, সবই আবার তিনি ফিরিয়া পাইলেন। তাঁহার হৃদয়ে তৃপ্তি, শান্তি এবং আনন্দ আবার আগের মতই ফিরিয়া আসিল। দেবানন্দপুরের প্রতিবাসীরা এতদিন ন্যাড়ার অনুপস্থিতিতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়া ছিল। কিন্তু আবার ন্যাড়া ফিরিয়া আসায় তাহাদের পূর্ব্বের অশান্তির আবার সৃষ্টি হইল। শরৎচন্দ্র তাঁহার পূর্ব্বের দলটি লইয়া আবার পাড়া-প্রতিবাসীদের আতঙ্কের কারণ হইয়া উঠিলেন। সদানন্দ নামে একটি ছেলে হইল এবার তাঁহার প্রধান শিষ্য।

আবার পাড়া-প্রতিবাসীদের বাগান হইতে পূর্ব্বের মতই ফলমূল অদৃশ্য হইতে লাগিল। দীঘির ধারে, আম বাগানের মধ্যে, উঁচু গড়ের আড়ালে এক গভীর খাদের মধ্যে ছিল এই দলটির প্রধান আড্ডাস্থল। সেইখানেই বসিয়া তাহারা অপহৃত ফল-মূলাদির সদ্ব্যবহার করিত।

সেই অপহৃত ফলমূলে কেবল যে তাহারা নিজেদেরই উদর পূর্ণ করিত তাহা নহে। দরিদ্র অভাবগ্রস্ত পাড়া-প্রতিবাসীদের খোঁজ লইয়াও সেই সমুদয় ফলমূল তাহাদের মধ্যে যথারীতি বিতরিত হইত।

শরৎচন্দ্রের নির্দ্দেশ মতই তাহা দেওয়া হইত। এইসব কাজে সদানন্দ ছিল শরৎচন্দ্রের দক্ষিণ হস্ত।

আগে দেবানন্দপুরে থাকিবার সময় পুকুরে চেলা, পুঁটি প্রভৃতি ছোট মাছ ধরা ছিল শরৎচন্দ্রের একটা বড় বাতিক। আবার সেই বাতিক তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। কিন্তু এবার আর ছোট মাছ নয়,—এবার তিনি ছেলেদের সঙ্গে তাদের ডিঙ্গিতে চড়িয়া বড় মাছ ধরিতে বাহির হইতে লাগিলেন। ডিঙ্গি নদীর স্রোতে আর দাঁড়ের টানে ভাসিয়া চলিত, আর শরৎচন্দ্র নৌকার উপর বসিয়া মনের আনন্দে বাঁশী বাজাইতেন। যখন মন নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িত, তখন তিনি তামাক খাইয়া মনটাকে আবার তাজা করিয়া লইতেন। শরৎচন্দ্র যখন আরও ছোট বয়সে পেয়ারী পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়িতেন, তখন হইতেই তিনি তামাক খাওয়া অভ্যাস করিয়াছিলেন। ভাগলপুরে মামার বাড়ীর কড়া শাসনের মধ্যেও তিনি সেই অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। দেবানন্দপুরে ফিরিয়া আসায় আর কোন বাধা রহিল না। তাঁহার এই নির্জ্জন আড্ডাতেই তামাকের সমস্ত সাজসরঞ্জাম মজুদ থাকিত।

এইসব নানা কারণে শরৎচন্দ্র পাড়া-প্রতিবাসীদের নিকটে বখাটে বদছেলে বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। সদানন্দের অভিভাবকেরা কড়া হুকুম দিয়াছিলেন,—সদানন্দ শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মিশিতে পারিবে না। কিন্তু সদানন্দ সেই বাধা-নিষেধ গ্রাহ্যই করিত না।

এই সময় শরৎচন্দ্র সদানন্দের সঙ্গে দাবা খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। রাত্রে সদানন্দের বাড়ীর সংলগ্ন গাছে উঠিয়া সেইখান হইতে মই লাগাইয়া শরৎচন্দ্র নিঃশব্দে তাহাদের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত

হইতেন। সেখানে বসিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত দুই বন্ধুতে দাবা খেলা চলিত। গভীর রাত্রে শরৎচন্দ্র বাড়ী ফিরিয়া আসিতেন। শরৎচন্দ্র তাঁহার রচিত 'শুভদা' উপন্যাসে এই বন্ধুটিকে চিরজীবি করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

দেবানন্দপুরে আসিয়া শরৎচন্দ্র হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। শরৎচন্দ্র যেকি পড়াশুনা করিতেছেন না করিতেছেন, শরৎচন্দ্রের পিতা মতিবাবুর সে সংবাদ লইবার অবসর ছিল না; তিনি সর্ব্বদাই সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। অন্য কেহও এ সংবাদ রাখিত না। কাজেই শরৎচন্দ্রের দিনগুলি নিজের খেয়াল মতই অতিবাহিত হইত। কিন্তু স্কুলে ভাল ছেলে বলিয়াই শরৎচন্দ্রের বেশ সুনাম ছিল। ইহা পাড়া-প্রতিবাসীদের নিকটে একটা বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া মনে হইত।

এই সময়ে শরৎচন্দ্রের প্রাণে কাব্য রসাস্বাদের প্রেরণা জাগিয়াছিল। এই প্রেরণা তিনি তাঁহার ভাগলপুরের মামার বাড়ী হইতে লইয়া আসিয়াছিলেন। দেবানন্দপুরে আসিয়াও তিনি হৃদয় হইতে সেই কাব্য-পিপাসা দূর করিতে পারেন নাই।

এই বিষয়ে শরৎচন্দ্র নিজেই লিখিয়াছেন,—

"বাবার দেরাজ থেকে খুঁজে বার করলাম, 'হরিদাসের গুপ্তকথা' আর বেরোলো 'ভবানী পাঠক'। গুরুজনদের দোষ দিতে পারি না। স্কুলের পাঠ্য তো নয়, ও-গুলো বদ্‌ছেলের অপাঠ্য পুস্তক। তাই পড়বার ঠাঁই ক'রে নিতে হলো আমাকে বাড়ীর গোয়াল ঘরে। সেখানে আমি পড়ি, তারা শোনে।… একই স্কুলে বেশী দিন পড়লে বিদ্যে হয় না। একদিন মাষ্টারমশাই স্নেহবশে সে ইঙ্গিত দিলেন। আবার ফিরতে হ'লো শহরে।"

সাত

মতিবাবুকে আবার ফিরিতে হইল ভাগলপুরে। শরৎচন্দ্রকেও সেই সঙ্গে ভাগলপুরে যাইতে হইল। শরৎচন্দ্র তখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন।

ভাগলপুরে যাইয়া শরৎচন্দ্র তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। পুরাতন বন্ধুবান্ধব ও সঙ্গীরা আবার তাঁহাকে তাঁহাদের মধ্যে পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

ভাগলপুরের মামার বাড়ীর কঠিন শাসনে তখন আর শরৎচন্দ্রের ভয় পাইবার কোনও কারণ ছিল না, কারণ তিনি জানিতেন, কি করিয়া কঠোর নিয়ম-কানুনকেও ফাঁকি দেওয়া যায়। সেই শিক্ষার গুণেই শরৎচন্দ্র সেখানে মনের আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

ক্রমে শরৎচন্দ্রের পরীক্ষা দেওয়ার দিন ঘনাইয়া আসিল। মধ্যে কিছু দিন নানাকারণে পড়াশুনার কিছু ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন কিনা সেই বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট সন্দেহ জন্মিল। তিনি এইবার রাত্রি জাগিয়া পড়াশুনা আরম্ভ করিলেন। এই সময় তিনি বাবা তারকনাথের নামে চুল রাখিতে আরম্ভ করিলেন।

পরীক্ষা দেওয়া শেষ হইল। এইবার সুদীর্ঘ-অবসর। এই অবসরে শরৎচন্দ্র প্রথম সাহিত্য-সেবা আরম্ভ করিলেন। বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহার মাথায় লম্বা চুল এবং উপন্যাস লেখা দেখিয়া তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিতে লাগিল,—"কি রে তুই কি রবি ঠাকুর হবি না কি ?"

শরৎচন্দ্র ঘাড় বাঁকাইয়া স্মিত হাস্যে উত্তর করিতেন,—"কে জানে, —তবে হবার চেষ্টা করবো।"

শরৎচন্দ্র প্রথম যে উপন্যাস লিখিলেন তাহার নাম দিলেন,—"বাসা।" সে উপন্যাস ছাপা হয় নাই। পরে শরৎচন্দ্র নিজেই ভাল হয় নাই বলিয়া তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বাহির হইল। শরৎচন্দ্র পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলেন। সেটা ১৮৯৪ সাল। শরৎচন্দ্রের বয়স তখন আঠারো বৎসর।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করিয়া শরৎচন্দ্র তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে এফ-এ পড়িবার জন্য ভর্ত্তি হইলেন। আত্মীয় স্বজনের ইচ্ছা ছিল, শরৎচন্দ্র উকীল হউক। কিন্তু শরৎচন্দ্রের হৃদয়ে বোধহয় উকীল হইবার ইচ্ছা কোনো দিনই ছিল না।

সাহিত্যের সহিত পরিচিত হবার পর শরৎচন্দ্রের সাহিত্যপ্রীতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। স্কুল জীবনে বঙ্কিম, মাইকেল, দীনবন্ধু প্রভৃতি বিখ্যাত সাহিত্যিক ও কবিদিগের সাহিত্য ও কবিতা তাঁহার মনে ধীরে ধীরে কল্পনা ও ভাবপ্রবণতার সৃষ্টি করিয়াছিল। বিশেষ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-সাহিত্য তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল।

বঙ্কিমের সাহিত্য সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র নিজেই লিখিয়াছেন,—

"খবর পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর। উপন্যাস-সাহিত্যের পরেও যে কিছু আছে তখন ভাবতে পারতাম না, প'ড়ে প'ড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হ'য়ে গেল।"

মাত্র সতর বৎসর বয়সেই শরৎচন্দ্র সাহিত্য-রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই বয়সে কোনও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব

নহে। তাই তাঁহার তখনকার লেখাগুলি তাঁহার নিজেরই পছন্দ হইত না।

কলেজে প্রবেশ করিয়া সাহিত্য সম্বন্ধে আরও অধিক জানা শুনার আগ্রহ জাগে শরৎচন্দ্রের হৃদয়ে। সেই আগ্রহাতিশয্যে শরৎচন্দ্র বিদেশীয় সাহিত্য পাঠে মনোযোগী হন। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই থ্যাকারে, ডিকেন্স, মেরী করোলী, হেনরী উড প্রভৃতি বিখ্যাত ইংরেজ লেখকদের উপন্যাস পড়িয়া ফেলিলেন। এই সব লেখা তাঁহার বড় ভাল লাগিত।

ক্রমেই সাহিত্য-সাধনায় তিনি নিবিড় ভাবে জড়াইয়া পড়িতে লাগিলেন। বাড়ীর লোকেরাও তাঁহার সাহিত্য-প্রীতির কথা জানিতে পারিলেন। যখন তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, শরৎচন্দ্র সাহিত্য-সেবা আরম্ভ করিয়াছেন, তখন তাঁহারা শরৎচন্দ্রের উকীল বা তদ্রূপ বড় কিছু হওয়ার আশা ছাড়িয়া দিলেন। সাহিত্যসেবী হইয়া শরৎচন্দ্রকে সারাজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গেই সংগ্রাম করিয়া অতিবাহিত করিতে হইবে, এই ধারণা সকলের মনেই বদ্ধমূল হইয়া গেল।

নিজেদের সংসারের দারিদ্র্যের কথা, মাতাপিতার দুঃখের কথা শরৎচন্দ্র গভীর ভাবেই অনুভব করিতেন এবং সে জন্য নিবিড় ভাবে চিন্তাও করিতেন। কিন্তু সংসারের দারিদ্র্য মোচনের চেষ্টা বা আগ্রহ তাঁহার মধ্যে ছিল না। তাঁহার অন্তরে দিন দিনই যেন উদাস ছন্নছাড়া ভাব মাথা তুলিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল। কোনও বাঁধাধরা নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে তিনি ধরা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। জীবনে স্বাধীনভাবে কাটাইবেন ইহা যেন প্রথম হইতেই তাঁহার কাম্য ছিল।

শরৎচন্দ্র এই সময় রাজু বা রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার নামক একটি বালকের সংস্পর্শে আসেন। রাজুর সংশ্রবে আসিয়াই শরৎচন্দ্রের মনের ছন্নছাড়া উদাস ভাব আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই রাজু বালকটি পড়াশুনা ব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয়ে ছিল শরৎচন্দ্রের উপরে। তাই শরৎচন্দ্র ইহাকে গুরু বলিয়া মানিতেন। তাঁহার চরিত্রের অনেক দোষের শিক্ষা হয় এই রাজুর নিকট হইতে। নদীতে সাঁতার কাটা, জেলেদের ডিঙ্গি চুরি করিয়া গোপনে গোপনে তাহাতে চড়িয়া মাছ ধরিতে যাওয়া, রাত্রে বাড়ী হইতে পলাইয়া যাত্রা শুনিতে যাওয়া ইত্যাদি নানাপ্রকার দুঃসাহসিক কার্য্যে রাজু ছিল শরৎচন্দ্রের পরিচালক এবং সাথী।

বাঁশী, এস্রাজ, হারমোনিয়াম প্রভৃতি বাজানো শরৎচন্দ্র শিক্ষা করেন রাজুর কাছে। আবার গাছে উঠিয়া গাছের ডালে বসিয়া ঘুমানও শরৎচন্দ্রের শিক্ষা রাজুর নিকট হইতে। এই দুইবন্ধুর জীবন কাটিয়াছিল বহুদিন এক সঙ্গে। রাজুর স্মৃতি শরৎচন্দ্রের জীবনের বহু অংশ ব্যাপিয়া বর্ত্তমান ছিল। শরৎচন্দ্র এই বন্ধুটির স্মৃতি বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'শ্রীকান্তের' প্রথম পর্ব্বে। শ্রীকান্তের দুর্দ্দান্ত ও দুঃসাহসী খামখেয়ালী ইন্দ্রনাথের চরিত্র এই রাজুর চরিত্রের অনুকরণেই সৃষ্ট।

ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকীল চন্দ্রশেখর সরকার মহাশয়ের বাড়ীতে 'বিল্বমঙ্গল' অভিনীত হয়। রাজু পাগলিনীর অংশ এবং শরৎচন্দ্র চিন্তামণির অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই অভিনয় শেষে রাজু যে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল আর তাহার দেখা পাওয়া গেল না, শরৎচন্দ্রও আর জীবনে তাহার সন্ধান পান নাই।

শরৎচন্দ্র যখন প্রথম কলেজে প্রবেশ করেন তখন পড়া শুনায় তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। কিন্তু রাজুর সঙ্গে মিশিবার পর হইতে তাঁহার পড়াশুনার প্রতি অনুরাগ অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ করে। শরৎচন্দ্রের মাথায় ঢোকে ভবঘুরে জীবনের উদ্দাম লালসা।

১৮৯৫ সালে অর্থাৎ কলেজে ঢুকিবার প্রায় এক বৎসর পরে শরৎচন্দ্রের জননী ভুবনমোহিনী দেবী পরলোক গমন করেন। মাতৃবিয়োগে শরৎচন্দ্র প্রাণে দারুণ আঘাত পাইলেন। কারণ শরৎচন্দ্র মাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন।

আট

পত্নী বিয়োগের পর শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলালবাবু পুত্র কন্যাদের লইয়া ভাগলপুরের স্বতন্ত্র এক পল্লীতে যাইয়া বাসা ভাড়া করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ভাগলপুরের এই অঞ্চলটা খঞ্জরপুর নামে পরিচিত।

খঞ্জরপুরে অবস্থানের সময় শরৎচন্দ্রের জীবনে সাহিত্য সাধনার একটা প্রবল প্রেরণা আসে। সেখানে শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া সমবয়সী দিগের একটা ছোটখাট সাহিত্য-চক্রও গড়িয়া উঠে। এই সময় বিভূতিভূষণ ভট্ট ও তাঁহার ভগিনী সুবিখ্যাত নিরুপমা দেবীর সহিত শরৎচন্দ্রের পরিচয় হয়। বিভূতিবাবুর দাদারা ছিলেন শরৎচন্দ্রের বন্ধু, বিভূতিবাবু ছিলেন ছোট, তাই তিনি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মিশিতে সাহস করিতেন না। বিভূতিবাবু তখন স্কুলে পড়িতেন। সেই পরিচয় ক্রমে গভীর এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

বিভূতিবাবু ও নিরুপমা দেবী তাঁহাদের সেই খঞ্জরপুরের অতীত জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু লিখিয়াছেন। সেই লেখার মধ্য হইতে শরৎচন্দ্রের জীবনের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়,—

"আমাদের কবিতার খাতা পুরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কেমন করিয়া জানি না, সেই সব লেখা, বিশেষতঃ নিরুপমার লেখা খাতাখানা শরৎচন্দ্রের হাতে গিয়া পড়িয়াছিল। দাদাদের মধ্যে কেহ হয়ত উহা শরৎচন্দ্রের হাত দিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র তখন সমবয়স্কদের মধ্যে একজন উচ্চ জগতের জীবরূপে এবং অত্যদ্ভুত 'ল্যাড়া' নামে অভিহিত। উপরন্তু তাঁহার তৎকালিক স্বাক্ষরিত নাম St. Clare

Lara।...আমরা ছোটরা তখন ঐ অদ্ভুত মানুষটিকে দূর হইতে সসম্ভ্রমে দাদাদের পড়িবার ঘরে আসা-যাওয়া করিতে বা দাবা-পাশা খেলিতে দেখিতাম। এহেন শরৎচন্দ্র সেই Lara একদিন হঠাৎ আমার ছোট কুঠুরীর মধ্যস্থিত অতিক্ষুদ্র টেবিলটির পার্শ্বে আসিয়া হাজির। আমি ভয়ে ভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।—তিনি আমার কবিতার খাতাখানা টেবিলের উপর সজোরে ফেলিয়া বলিলেন,—'কি ছাই লেখো, খালি অনুবাদ, তাও আবার ভুলে ভরা। নিজের কিছু নাই তোমার লেখিবার!' আমি তো শুনিয়া পৌনে মরা! কিন্তু তারপর কখন যে আমাদের আলাপ জমিয়া উঠিল এবং কবে যে তাঁহার খোলার ঘরের বই খাতাপত্রে ভরা টেবিলের পাশে বসিবার অধিকার পাইলাম, তাহা আজ স্মরণ হয় না। কেবল এইটুকু মনে আছে যে, তাঁহার সেই প্রথম জীবনের সাহিত্য-সাধনার কুঠুরীর মধ্যে অতি সহজেই আমার স্থান হইয়াছিল। দিনের পর দিন তাঁহারই সাহচর্য্যে রবীন্দ্র-নাথের কাব্যকাননে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইলাম।...শরৎচন্দ্র রসস্রষ্টা রূপেই শেষ জীবনে প্রকটিত। কিন্তু যৌবনে একাধারে নট, সঙ্গীতজ্ঞ, যন্ত্রী এবং কাব্যরসজ্ঞ কবি—কত না নূতন নূতন রূপে তাঁহাকে দেখিয়াছি। মনে পড়ে আদমপুর ক্লাবে ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের লিখিত 'জনার' অভিনয়। জনার পার্টের অভিনয়ে তরুণ শরৎচন্দ্র যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন পরবর্ত্তী কালে কলিকাতার প্রসিদ্ধা অভিনেত্রীর মধ্যে তাহা দেখিয়াছিলাম কিনা সন্দেহ। আমরা সে সময়ে যে পাড়ায় থাকিতাম তাহার নাম খঞ্জরপুর। সেই পাড়ার প্রতিবেশী বালক ও যুবকগণ শরৎচন্দ্রের নায়কত্বে আমাদের লইয়া ছোট একটা থিয়েটার পার্টি গঠন করিয়াছিল। তাহাতে যে অভিনয়

হইত শরৎচন্দ্র ছিলেন তাহার প্রযোজক এবং শিক্ষক। নদীর ধার ('তখনকার যমুনিয়া এখন নাই) হইতে মুসলমানের কবরস্থান, দেবস্থান কোনো স্থানই বাদ যাইত না। শরৎচন্দ্র চিরদিনই বেপরোয়া,—কোনো দ্বিধা তাঁহাকে কখনো বাধা দিতে পারিত না। সেই জন্যই বোধ হয় তিনি বাল্যজীবনের এই সঙ্গী কয়টার অনেকেরই মধ্যে ইহা সঞ্চারিত করিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র সঙ্গী কয়টাকেও এই সময় অনেকটা বেপরোয়া করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমাদের খঞ্জরপুরের বাড়ীর পাশেই একটা মস্‌জিদ ছিল এবং হয়তো এখনও আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলা কবর আছে। আমরা হিন্দুঘরের ভীরু ছেলে, কিন্তু এই পরম সাহসিকতার (শরৎচন্দ্র) সঙ্গগুণে 'মামদো' ভূতই বল, আর ব্রহ্মদৈত্যই বল, সকল ভয়কেই তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছিলাম। কত গভীর অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি এই কবরস্থানের মধ্যেই কাটিয়া গিয়াছে। শরৎদার বাঁশী চলিতেছে—না হয় হারমোনিয়াম সহ গান চলিতেছে এবং আমরা দু-চারজন বসিয়া তন্ময় হইয়া শুনিতেছি। কখনো বা গভীর অন্ধকার রাত্রে গুরুজনের রক্ত নয়ন এবং দাদাদের চপেটাঘাত উপেক্ষা করিয়া গঙ্গার চড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি কিংবা থিয়েটারের রিহার্সাল-কক্ষে বাঁশ মাথায় দিয়া শতরঞ্জিতে পড়িয়া রাত্রি কাটাইয়াছি।"

নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"আমার দাদারা তাঁহাকে কতদিন হইতে জানিতেন তাহা ঠিক জানি না। কিন্তু আমি জানিলাম যখন আমার লেখা কবিতা লইয়া দাদারা অত্যন্ত আলোচনা করেন তখন। দাদাদের এক বন্ধু তাঁহার নাম শ্রীশরৎচন্দ্র, তিনিও দাদাদের মারফৎ আমার পাঠক ও

সমালোচক। এবার অল্পদিনের মধ্যেই আমার মেজ ভাজ মেজদার নিকট হইতে এক বৃহদায়তন খাতা আমাদের সেই ক্ষুদ্র পরিসর 'সাহিত্যচক্রে' হাজির করিলেন। তাহা অতি সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তাক্ষরে লিখিত, নাম 'অভিমান'! শুনিলাম, দাদাদের উক্ত বন্ধু শরৎচন্দ্রই উহার লেখক। গল্পটি পড়িয়া যখন আমরা অভিভূত, তখন মেজদা সাড়ম্বরে গল্প করিলেন যে, 'এই গল্পটি প'ড়ে একজন ন্যাড়াকে মারতে ছুটে, তাকে তখন ওই পাঠকের ভয়ে ক'দিন লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াতে হয়।' ক্রমে বৌদিদি দাদার নিকটে তাঁহার বন্ধুর সম্বন্ধে আরও কিছু কিছু গল্প সংগ্রহ করিয়া আমাদের মধ্যে প্রচার করিলেন। আমরা তখন 'অভিমানের' লেখকের উপর অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন। সেই উদাসী কবি-স্বভাব বিশিষ্ট লেখকটিকে আমাদের বাসার পশ্চিম দিকে যে প্রকাণ্ড মস্‌জিদ ছিল তাহার বৃক্ষছায়াময় পথে কখনো কখনো দেখা যাইত। কোনো গভীর রাত্রে সেই মস্‌জিদের সুউচ্চ প্রাঙ্গণ চত্বর হইতে গানের শব্দ, কখনো 'যমানিয়া' নদীর তীর হইতে বাঁশীর আওয়াজ ভাসিয়া আসিলে মেজদা মেজবৌকে শুনাইয়া বলিতেন, 'এ ন্যাড়া চন্দ্রের কাণ্ড।'......আমাদের দল এক দিন বায়ুপথে ভাসিয়া আসা গানের এক লাইন আবিষ্কার করিল,—

'আমি দুদিন আসিনি, দুদিন দেখিনি
অমনি মুদিলি আঁখি।'

ইহার পরে দাদাদের বৈঠক খানায় তাঁহার কণ্ঠের আরও গান আমরা ভিতর হইতে শুনিয়াছি; কিন্তু বাঁশী কখনো সে সব বৈঠকের মধ্যে তিনি বাজান নাই। নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের রচিত আরও একটি গান তাঁহার প্রিয় ছিল,—

'গোকুলের মধু ফুরায়ে গেল,
আঁধার আজি কুঞ্জবন'।"

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, প্রথম হইতেই শরৎচন্দ্র ছিলেন ভাবভোলা খামখেয়ালী বন্ধন-লেশশূন্য। কোনও বন্ধনের মধ্যে, কোনও গণ্ডীর মধ্যে তিনি ধরা দিবেন এ ধাতেই তাঁহার মনটি গড়া নহে। স্রোতের তৃণের মত অবাধে ভাসিয়া চলিবেন, কখনও কোনও চড়ায় লাগিবেন, আবার ভাসিয়া চলিবেন, চিরদিন কোথায়ও আটকাইয়া থাকিবেন না। সকল সময়েই তাহার মনে যেন কিসের সন্ধানে ছুটিয়া চলার আকাঙ্ক্ষা, বুকে কিসের যেন আকুল আগ্রহ।

শরৎচন্দ্রের এফ. এ. পরীক্ষা দেওয়ার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত পড়া-শুনা তিনি কিছুই করেন নাই। সে ভাবনাও তাঁহার মনে কখনও উদয় হয় নাই। দাবা খেলা, বাঁশী বাজান, গান গাওয়া, থিয়েটারের রিহার্সেল দেওয়া আর গল্প উপন্যাস লেখা,—ইহা লইয়াই তাঁহার সময় যে কি করিয়া কোথা দিয়া কাটিয়া যাইত, তাহা তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। রাজুর সঙ্গে পড়িয়াও রাত্রে নদীতে ডিঙ্গি ভাসাইয়া মাছ ধরার ব্যাপারে কম সময় যায় নাই। এবার পরীক্ষার সময় একেবারেই নিকটে আসিয়া পড়ায় শরৎচন্দ্রের চৈতন্যোদয় হইল। আর ত সময় নষ্ট করা চলে না। বাঁশী বাজান, দাবা খেলা, থিয়েটার করা, গান গাওয়া সবই তিনি দূরে সরাইয়া রাখিয়া এবার গভীর মনঃ সংযোগে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সারারাত বসিয়া তিনি তামাক খান আর বই পড়েন।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের ভাগ্যক্রমে সবই ওলোট পালোট হইয়া গেল। তাঁহার আর এফ. এ. পরীক্ষা দেওয়া হইল না।

একদিন সহসা শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল বাবু বিষণ্ন মুখে শরৎচন্দ্রের পড়ার ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, "ন্যাড়া তোর আর পরীক্ষা দেওয়া হ'লো না, পরীক্ষার ফিঃ-এর টাকা কোথাও যোগাড় করতে পারলাম না।"

এই কথা শুনিয়া শরৎচন্দ্র কিছুক্ষণ বাবার মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তখন তাঁহার মনে কি হইতেছিল কে জানে? কিন্তু পিতার মনের কষ্টের কথা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার মনেও যে দারুণ ব্যথার সঞ্চার হইয়াছিল তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারা গিয়াছিল। নিজে পরীক্ষা দিতে পারিবেন না, সেজন্য নয়, শরৎচন্দ্রের চোখ ছল ছল করিয়া জলে ভরিয়া আসিতেছিল তাঁহার পিতার মনের দারুণ দুঃখ অনুভব করিয়া।

শরৎচন্দ্র কম্পিত কণ্ঠে পিতাকে বলিলেন, "টাকা যোগাড় করতে পারনি তাতে হয়েছে কি? তুমি আর কারো কাছে টাকা চাইতে যেয়ো না বাবা, আমি পরীক্ষা দেবো না।"—এই বলিয়া শরৎচন্দ্র ঘরের বাহির হইয়া গেলেন। বাবার সম্মুখে তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

শরৎচন্দ্রের মামারা বড় লোক। তাহা ছাড়া শরৎচন্দ্রের বন্ধু বান্ধবের অভাব ছিল না। পরীক্ষার ফিঃ-এর মাত্র কুড়িটি টাকা তিনি কাহারও কাছে একবার চাহিলেই হয়ত যোগাড় করিতে পারিতেন। কিন্তু আত্মসম্মানে আঘাত লাগিবার ভয়ে মুখ ফুটিয়া চাহিতে পারিলেন না। কাজেই শরৎচন্দ্রের আর এফ্. এ. পরীক্ষা দেওয়া হইল না।

এফ্. এ. পরীক্ষার ছয় সাত মাস পূর্ব্বে শরৎচন্দ্র একবার কিছুদিনের জন্য নিরুদ্দেশ হইয়া যান। এই নিরুদ্দেশের একটা কারণ ছিল। তখনকার ভাগলপুরের প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজের মধ্যে দুইটি দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। একদল উদারনীতিক দল, আর একদল গোঁড়া রক্ষণশীল। প্রথম দলের নেতা ছিলেন ভাগলপুরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আর দ্বিতীয় দলের নেতা ছিলেন শরৎচন্দ্রের মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এই উভয় দলের নেতার বাড়ী ছিল পাশাপাশি। কিন্তু এই দুই বাড়ীর আচার-আচরণ ও চালচলনে ছিল ভয়ানক পার্থক্য। গাঙ্গুলী বাড়ী হিন্দু সমাজের নিয়ম-কানুন কুসংস্কার প্রভৃতি অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলিতেন, তাহার একটু ব্যতিক্রম হইবার উপায় ছিল না। কিন্তু বাঁড়ুয্যে বাড়ী ছিল উদার মতাবলম্বী, হিন্দু সমাজের কড়াকড়ি তাঁহারা বড় গ্রাহ্যই করিতেন না।

রাজা শিবচন্দ্রের বাড়ীতে খেলাধূলা গান বাজনা অষ্ট প্রহরই চলিত, আর সেখানে ছিল যাত্রা এবং থিয়েটারের আখড়া। তাই পাড়ার যুবক, কিশোর ও বালকদিগের কলকোলাহলে সেই বাড়ীটি সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত। শিবচন্দ্রের পুত্র সতীশচন্দ্র ছিলেন শরৎচন্দ্রের বন্ধু। 'আদমপুর ক্লাবের' তিনিই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। যাত্রার আখড়া থাকায় এই বাড়ীতে সন্ধ্যা হইতে বাজিয়া উঠিত বাঁশী ও হারমোনিয়ামের সুর ও বাঁয়া তবলার শব্দ, আর যুবক ও বালকেরা দলে দলে আসিয়া সেখানে জড় হইত। এদিকে আবার শরৎচন্দ্রের বন্ধু রাজু ছিল যাত্রার দলের প্রধান পাণ্ডা। শরৎচন্দ্রের মন সেই বাড়ীতে যাইয়া দলে যোগ দান করিবার জন্য হাঁপাইয়া উঠিত, তিনি

দূর হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া দেখিতেন, কিন্তু নিজেদের রক্ষণশীল বাড়ীর ভয়ে সেই বাড়ীতে ঢুকিতে সাহস করিতেন না। শরৎচন্দ্র নিজে ভাল গান গাহিতে পারিতেন, বাঁশী এবং হারমোনিয়ামে দক্ষতাও কম নহে, তাহার উপর তিনি ভাল যাত্রার ও থিয়েটারের পার্ট করিতে পারিতেন। এই অবস্থায় সেই দলে যোগদান করিতে না পারাটা তাঁহার কম দুঃখের কথা নহে।

শরৎচন্দ্র আর বেশী দিন দূরে থাকিতে পারিলেন না। বাড়ীর বাধা-নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি বাঁড়ুয্যে বাড়ীতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই তিনিও দলের একজন পাণ্ডা হইয়া দাঁড়াইলেন।

শিবচন্দ্র যাত্রার আখড়াটিকে সখের থিয়েটারে পরিবর্ত্তিত করিলেন। মাসে মাসে সেখানে থিয়েটারের অভিনয় হইতে লাগিল। ভাগলপুরের বাঙ্গালী সমাজ সেখানে থিয়েটার দেখিতে আসিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ ভাগলপুর বাঙ্গালী সমাজে বাঁড়ুয্যে পরিবারের প্রাধান্য এবং প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া গোঁড়ার দল ভয় পাইয়া গেলেন। তাঁহাদের চেষ্টা হইল, কিরূপে তাঁহারা বাঁড়ুয্যে পরিবারের প্রতিপত্তি নষ্ট করিবেন। অবশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া এক উপায় ঠিক করিলেন।

গোঁড়া দলের কর্ত্তারা স্থির করিলেন, যে সব যুবক বাঁড়ুয্যে বাড়ীতে যাতায়াত করে তাহাদিগকে সমাজচ্যুত করিতে হইবে। তাঁহাদের যত রাগ গিয়া পড়িল বাঁড়ুয্যে বাড়ীর থিয়েটারের দলটির উপর। তাই থিয়েটার দলের সকলেই সমাজচ্যুত হইল। শরৎচন্দ্র পড়িলেন এই সমাজচ্যুত দলে।

প্রত্যেক বৎসর গাঙ্গুলী বাড়ীতে খুব ধূমধামের সহিত জগদ্ধাত্রী পূজা হইত। প্রত্যেক বারই শরৎচন্দ্রের উপর ভার পড়িত নিমন্ত্রিত দিগকে পরিবেশন করার। পাড়ার একনিষ্ঠ হিন্দু বাঙ্গালীরা জানাইলেন, শরৎচন্দ্র যদি পরিবেশন করেন তবে তাঁহারা জলগ্রহণ করিবেন না। তাই শরৎচন্দ্র সেবার জগদ্ধাত্রী পূজার উৎসবানন্দ হইতে বঞ্চিত হইলেন। এই সামাজিক জঘন্য হীন অত্যাচারে শরৎচন্দ্র হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলেন। সমাজের বিরুদ্ধে তাঁহার মন ভয়ানক বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সেই আঘাতে শরৎচন্দ্র কিছুদিনের জন্য কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন।

তিনি ফিরিয়া আসিলেন এফ এ. পরীক্ষার কিছু দিন আগে। আসিয়াই পড়াশুনায় গভীর ভাবে মন দিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন, টাকার অভাবে তাঁহার পরীক্ষা দেওয়া হইবে না, তখন তিনি মনে দারুণ আঘাত পাইলেন, তাঁহার মন একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি পড়াশুনা বন্ধ করিয়া আবার ডুবিয়া পড়িলেন তাস, পাশা, দাবা, গান-বাজনা আর সাঁতার কাটায়। কিন্তু বই লেখার আগ্রহ তাঁহার মোটেই হ্রাস পাইল না, বরং বাড়িয়াই চলিল। সারাদিন নানা কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে ব্যস্ত থাকিয়া রাত্রে তাঁহার নিরালা ঘরটিতে টেবিলের উপর খাতা লইয়া তিনি লিখিতে বসিতেন। নিবিষ্ট মনে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত লেখা চলিত। লিখিতে লিখিতে তিনি বড়ই আনন্দ পাইতেন।

নয়

পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের যে সাহিত্য-সভা ছিল, শরৎচন্দ্র ছিলেন তাহার গুরু। আর তাঁহার সহিত ছিলেন নিরুপমা দেবী, বিভূতিভূষণ ভট্ট, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি নবীন ও তরুণ সাহিত্যিকের দল।

একদিন শরৎচন্দ্র একখানা হাতের লেখা মাসিক পত্র বাহির করিবার প্রস্তাব করিলেন। সেই প্রস্তাব সকলেরই মনঃপূত হইল। তখনই মাসিকপত্র বাহির করিবার কাজ আরম্ভ হইয়া গেল। মাসিক পত্রিকাখানার নাম করা হইল 'ছায়া'। সাহিত্য-সভার অধিবেশনে যে লেখাগুলি ভাল বলিয়া বিবেচিত হইত তাহাই 'ছায়া' পত্রিকায় স্থান পাইত।

এই সাহিত্য-সভা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন,—"আমি ছিলাম সভাপতি, কিন্তু আমাদের সাহিত্য-সভায় গুরুগিরি করিবার অবসর অথবা প্রয়োজন আমার কোনো কালেই ঘটে নাই। সপ্তাহে একদিন করিয়া সভা বসিত এবং অভিভাবক ও গুরুজনদের চোখ এড়াইয়া কোন একটা নির্জ্জন মাঠের মধ্যেই বসিত। জানা আবশ্যক যে, সে সময়ে সে দেশে সাহিত্যচর্চ্চা একটা গুরুতর অপরাধের মধ্যেই গণ্য ছিল। এই সভায় মাঝে মাঝে কবিতা পড়া হইত। গিরীন পড়িতে পারিত সবচেয়ে ভাল, সুতরাং এ ভার তাহার উপরেই ছিল, আমার উপর নয়। কবিতার দোষগুণ বিচার হইত এবং উপযুক্ত বিবেচিত হইলে সাহিত্য-সভার মাসিকপত্র 'ছায়ায়' প্রকাশিত হইত।"

ঠিক এই সময়েই কলিকাতার ভবানীপুর হইতেও একখানা হাতের লেখা মাসিক-পত্রিকা বাহির হইত। উহার নাম ছিল 'তরণী'। ইহার লেখকদের মধ্যে সকলেই ছিলেন তরুণ এবং শরৎচন্দ্রের বন্ধু। ভাগলপুরের নবীন সাহিত্যিক দল তাঁহাদের মাসিক পত্রিকা 'ছায়া' ভবানীপুরের 'তরণীর' দলের কাছে পাঠাইতেন, আবার 'তরণীর' দলও তাঁহাদের পত্রিকা ভাগলপুরের দলের কাছে পাঠাইতেন। উভয় পত্রিকাতেই উভয় দলের লেখার সমালোচনা বাহির হইত।

শরৎচন্দ্রের প্রথম বয়সের অনেক লেখাই 'ছায়ায়' প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার প্রায় বিশ বছর পরে 'যমুনা' এবং 'সাহিত্যে' সেই লেখাগুলি আবার ছাপা হইয়াছিল।

শরৎচন্দ্রের এই বয়সের অনেক লেখাই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'বাসার' আর চিহ্ন পাওয়া যায় না। 'অভিমান' নামক উপন্যাস খানির অবস্থাও তাহাই। 'পাষাণ' নামে একটি রচনা শরৎচন্দ্রের মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকটে ছিল, কিন্তু তাহাও তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'কাশীনাথ', 'অনুপমার প্রেম', 'কোরেলগ্রাম', 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ', 'হরিচরণ', 'দেবদাস', 'বাল্যস্মৃতি' —এই সমস্তই শরৎচন্দ্রের তরুণ বয়সের লেখা, এই সমস্তগুলিই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 'শুভদা' নামে আর একখানি উপন্যাস শরৎচন্দ্র এই সময় লিখিয়া শেষ করিয়াছিলেন।

শরৎচন্দ্র যতক্ষণ বাহিরে থাকিতেন ততক্ষণ তাঁহার মনের অবস্থা ভালই থাকিত, কিন্তু বাড়ীতে ঢুকিলেই সংসারের দুরবস্থা দেখিয়া

তাঁহাব মন বিষাক্ত হইয়া উঠিত। মতিবাবু তখন দারুণ দুরবস্থায় পড়েন, সংসার আর চলিতেছিল না। দুই বেলা যে তিনি ছেলে-মেয়েদের মুখে দুই মুষ্টি অন্ন তুলিয়া দিবেন, সে অবস্থাও তাঁহার ছিল না। সংসারের এই ভাব দেখিয়া শরৎচন্দ্রের হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি স্থির করিলেন, সংসারের এই অভাব মিটাইবার জন্য কোথায়ও একটা কোনও চাকরী ঠিক করিয়া লইবেন।

রাজবানলী এষ্টেটে তাঁহার একটা চাকরীও জুটিয়া গেল। শিবশঙ্কর শাহু সানন্দেই শরৎচন্দ্রকে চাকরীটি দিয়াছিলেন। তিনি শরৎচন্দ্রকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কিছুদিন শরৎচন্দ্র সেখানে চাকরী করিলেন। এই চাকরী করিবার সময় তিনি শিকার করা ও বন্দুক ছোঁড়া অভ্যাস করেন।

এই চাকরী শরৎচন্দ্রের বেশী দিন ভাল লাগিল না। একদিন তিনি হঠাৎ চাকরীটা ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে ন্যাড়া, চাকরীটা ছেড়ে দিলি!"

শরৎচন্দ্র তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দিলেন,—"দূর, ও সব ভাল লাগে না আমার।"

চাকরী ছাড়িয়া দিয়া শরৎচন্দ্র আবার বাজে কাজে মাতিয়া উঠিলেন। তারপর একদিন হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইয়া কোথায় চলিয়া গেলেন।

মতিবাবুর নানা প্রকার পাথর সংগ্রহের বড় বাতিক ছিল। এইরূপে তিনি কিছু মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য প্রস্তর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র এই পাথরগুলির মূল্য বুঝিতেন না, এইগুলি তাঁহার নিকট নিতান্ত তুচ্ছ ও মূল্যহীন বলিয়াই মনে হইত। তাই একদিন

তাঁহার কোনও এক বন্ধুকে পাথরগুলি উপহার স্বরূপ দিয়া দিলেন। মতিবাবু যখন জানিতে পারিলেন, তাঁহার আদরের প্রিয় প্রস্তরগুলি এইরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে, তখন শরৎচন্দ্রের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করেন। এই তিরস্কারে পিতার উপর শরৎচন্দ্রের বড় অভিমান হয়, এই অভিমানের বশেই তিনি গৃহ হইতে একদিন সহসা অন্তর্দ্ধান করেন।

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিয়া শরৎচন্দ্র কিছুদিন এক সন্ন্যাসীর আখড়ায় কাটাইলেন। তাহার পর সন্ন্যাসীর বেশেই তিনি নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। কত প্রকার লোকের সঙ্গে তিনি মিশিলেন। শরীরে সন্ন্যাসীর বেশ, মুখে হিন্দি বুলি। লোকে তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়াই চিনিতে পারিল না; তাহারা মনে করিল, এ হিন্দুস্থানী যুবক সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসীর বেশে ঘুরিতে ঘুরিতে শরৎচন্দ্র অবশেষে মজঃফরপূরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে ধর্ম্মশালায় তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। সেখানে বসিয়া তিনি আপন মনের খেয়ালে গান গাহিতেন। মজঃফরপুরে তখন প্রসিদ্ধা ঔপন্যাসিকা শ্রীমতী অনুরূপা দেবী থাকিতেন। তিনি যখন ভাগলপুরে থাকিতেন তখন হইতেই তাঁহার সহিত শরৎচন্দ্রের পরিচয় হয়। অনুরূপা দেবী শরৎচন্দ্রের লেখার একজন ভক্ত ছিলেন। যে সময় শরৎচন্দ্র ধর্ম্মশালায় বাস করিতেছিলেন, তখন অনুরূপা দেবী ছিলেন ভাগলপুরে। তাঁহার এক দেবরের গান-বাজনার বড় সখ ছিল। একদিন শরৎচন্দ্রের গানে আকৃষ্ট হইয়া তিনি ধর্ম্মশালায় আসিয়া উপস্থিত হন। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার আলাপ-পরিচয় হইল। তিনি অনুরূপা দেবীর স্বামী

শিখরনাথ বাবুকে শরৎচন্দ্রের কথা বলিলেন। শিখরনাথ পূর্ব্বেই স্ত্রীর নিকট শরৎচন্দ্রের নাম শুনিয়াছিলেন। তাঁহারও গান-বাজনার প্রতি অত্যন্ত ঝোঁক ছিল। অনেক অনুরোধ করিয়া তিনি শরৎচন্দ্রকে ধর্ম্মশালা হইতে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। সেই হইতে শিখরনাথ বাবুর বাড়ীতে প্রায়ই গান-বাজনার আসর বসিত। সেই আসরে শরৎচন্দ্র গান গাহিতেন। এইরূপে শরৎচন্দ্র মজঃফরপুরের প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের সহিত পরিচিত হইলেন।

শরৎচন্দ্র দুই মাস শিখরনাথ বাবুর বাড়ীতেই অতিথিরূপে কাটাইলেন। এই সময়ে মজঃফরপুরের জমিদার বাবু মহাদেব শাহুর সহিত শরৎচন্দ্রের পরিচয় হয়। তিনি শরৎচন্দ্রকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি শরৎচন্দ্রকে নিজের কাছে লইয়া গেলেন।

মহাদেব শাহুর বাড়ীতে থাকিয়া শরৎচন্দ্র শিকার, গান-বাজনা আর বই লেখা লইয়া কাটাইতে লাগিলেন, ইহা ছাড়া তাঁহার আর অন্য কোনও কাজ ছিল না। এই সময় তিনি 'ব্রহ্মদৈত্য' নামে একখানি উপন্যাস রচনা করেন।

এই সময়ে শরৎচন্দ্র তাঁহার পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সাইকেলে চড়িয়া মজঃফরপুর হইতে ভাগলপুরের দিকে যাত্রা করিলেন।

শরৎচন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইলেন মাতাপিতৃহীন শোকক্লিষ্ট বিষণ্ণ ভাইবোনদের মাঝে। তাহাদের সেই শোকাচ্ছন্ন অসহায় মূর্ত্তি দেখিয়া ও পিতার স্মৃতি স্মরণ করিয়া দারুণ মর্ম্মবেদনায় তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সমস্ত দিন তিনি তাঁহার ছোট লিখিবার ঘরটির মেঝের উপর শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে পড়িয়া রহিলেন।

তাহার পর সন্ধ্যার সময় ঘর হইতে বাহির হইয়া শ্মশানে গিয়া বসিলেন। উদাস মনে চাহিয়া রহিলেন তারায় ভরা নীল আকাশের দিকে। কানে ভাসিয়া আসিতে লাগিল নদী-স্রোতের কল্লোল-ধ্বনি।

তাহার পর ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত হইল শরৎচন্দ্রের পিতৃ-শ্রাদ্ধের দিন। কিন্তু হাতে একটি পয়সা নাই, কি করিয়া তিনি পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিবেন? মামারা বড় লোক হইলেও এই দুঃসময়ে তাঁহারা এক পয়সা দিয়াও সাহায্য করিলেন না, উপায়ান্তর না দেখিয়া শরৎচন্দ্র অবশেষে নিজের সাইকেলটি আশী টাকায় বিক্রয় করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন।

এইবার শরৎচন্দ্র ছোট ছোট ভাইবোনদের লইয়া বড়ই বিপদে পড়িলেন। কোনও প্রকারে যে তিনি দুই বেলা তাহাদের মুখে দুই মুষ্ঠি অন্ন দিবেন সেই সম্বলও তাঁহার নাই। নানা দুশ্চিন্তায় শরৎচন্দ্র পাগল হইবার মত হইলেন। অনেক চিন্তা করিয়া ভাই-বোনদের জন্য একটা উপায় স্থির করিলেন। ভাই প্রভাসচন্দ্রের বয়স তখন মাত্র পনর বৎসর। তাঁহাকে আসানসোলে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে রাখা স্থির করিলেন। আত্মীয়টি তখন রেলে কাজ করিতেন। প্রভাসচন্দ্রকে তিনি কিছু কাজকর্ম্ম শিখাইবার ভার গ্রহণ করিলেন। ছোট বোন মনিয়ার বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র, তাহাকে খঞ্জরপুরের বাড়ীওয়ালা খুব ভালবাসিত, তাহাকে তাহার বাড়ীতেই রাখিলেন। আর এক ভাই প্রকাশচন্দ্র, তাহার বয়স আট বৎসর হইবে। তাহাকে লইয়া শরৎচন্দ্র চলিয়া গেলেন জলপাইগুড়িতে। সেখানে শরৎচন্দ্রের মামা ও বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাবা কাজ করিতেন। প্রকাশচন্দ্রকে সেখানে

তাঁহার নিকটে রাখার ব্যবস্থা করিয়া শরৎচন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন কলিকাতায়।

কলিকাতায় আসিয়া শরৎচন্দ্র ভবানীপুরে তাঁহার দূর সম্পর্কীয় এক মামা উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাসায় উঠিলেন। সেখানে থাকিয়া তিনি চাকরীর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উপেন্দ্রবাবুর বড় ভাই ছিলেন উকীল। শরৎচন্দ্রকে তাঁহার মামলার হিন্দী কাগজপত্র ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিতে হইল। সেই সঙ্গে আবার বাজার সরকারের কাজও করিতে হইত।

কিন্তু এই কাজ শরৎচন্দ্র বেশী দিন করিতে পারিলেন না, তাঁহার উহা মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। যাহা হউক, এই কাজ করিতে করিতে তিনি কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলেন। শেষে এক দিন সেই অর্থ লইয়া বাড়ীতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি রেঙ্গুনের জাহাজে উঠিয়া বসিলেন।

বাড়ীতে সকলে মনে করিল, ছেলেটা আবার নিরুদ্দেশ হইয়াছে।

দশ

শরৎচন্দ্র আসিয়া পৌঁছিলেন রেঙ্গুনে।

সম্পূর্ণ বিদেশী অপরিচিত শহর।…

শরৎচন্দ্র পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার কাপড়-চোপড় ময়লা। মুখ বিমর্ষ, চিন্তাক্লিষ্ট, উদরে দারুণ ক্ষুধার জ্বালা। পথে পথে ঘুরিয়া তিনি অঘোর বাবুর বাসা খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, অঘোরবাবু সেখানকার উকীল এবং শরৎচন্দ্রের মেশো মহাশয়। বাঙ্গালী দেখিলেই তিনি আগাইয়া যাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন,—"হাঁ, মহাশয় এখানকার উকীল অঘোরবাবুর ঠিকানাটা বলিতে পারেন?"

কেহ "জানি না" বলিয়া অবজ্ঞা ভরে চলিয়া যায়। কেহ বলে, "নাম শুনিয়াছি, কিন্তু ঠিকানা ত জানি না।" কেহ শরৎচন্দ্রের প্রতি অনুকম্পা দেখাইল না। কত বাঙ্গালীই ত এইরূপে আসিয়া রেঙ্গুনে উপস্থিত হয়, কে কাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে?

অবশেষে অনেক চেষ্টা এবং অনেক অনুসন্ধানের পর শরৎচন্দ্র অঘোরবাবুর বাসা খুঁজিয়া বাহির করিলেন। কিন্তু কি ভাবে তিনি তথায় গৃহীত হইবেন, সে সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মনে দারুণ সন্দেহ জন্মিল। দরিদ্র সম্বলহীন আত্মীয় স্বজনের প্রতি ধনবান্ আত্মীয় স্বজনেরা যে কোনও প্রকার সহানুভূতি বা অনুগ্রহ প্রদর্শন করে না, সেই বিষয়ে শরৎচন্দ্র তাঁহার জীবনে বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। সেই কথাই বার বার চিন্তা করিতে করিতে তিনি যাইয়া অঘোরবাবুর বাড়ীতে উঠিলেন।

অঘোরবাবুর নিকটে সংবাদ পাঠাইয়া তিনি তাঁহার বৈঠকখানায় চিন্তাকুল হৃদয়ে বসিয়া রহিলেন।

অঘোরবাবু আসিলে শরৎচন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পরিচয় দিতেই অঘোরবাবু আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন,—"শরৎ, তুই !···এতদিন কি করছিলি ! আগেই চলে আসতে পারতিস্।"

তাহার পর অঘোরবাবু অন্দর মহলে স্ত্রীর নিকট খবর পাঠাইলেন।

শরৎচন্দ্র বলিলেন,—"কি ক'রে আসবো মেশোমশায়, বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন, এতদূর আসতে তাঁর আপত্তি ছিল।"

অঘোরবাবু বলিলেন,—"তা আমিও বুঝেছিলাম। তুই যখন এণ্ট্রান্স পাস করলি তখনি আমি তোর বাবাকে লিখেছিলাম তোকে এখানে পাঠিয়ে দিতে। বর্ম্মী ভাষাটা শিখিয়ে তোকে এ্যাড্ভোকেট ক'রে দিতাম, এতদিনে বড় লোক হ'য়ে যেতে পারতিস্। তা তোর বাবা পাঠালো না।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন,—"মামাদেরও আপত্তি ছিল,—সমুদ্রযাত্রা করলে নাকি ধর্ম্ম নষ্ট হয়ে যায়।"

অঘোরবাবু দুঃখের সহিত বলিলেন,—"হ্যাঃ, জাহাজে চড়লেই যদি ধর্ম্ম যায়, তবে সে ধর্ম্ম না থাকাই ভাল।"

এমন সময় অঘোরবাবুর স্ত্রী আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। অঘোরবাবু পরিচয় করাইয়া দিলেন,—"শরৎ, ইনি তোর মাসী মা। ওগো, এ আমাদের মতিলালের ছেলে শরৎ।"

শরৎচন্দ্র মাসীমাকে প্রণাম করিলেন। মাসীমা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কাছে টানিয়া লইলেন।

অঘোরবাবুর বাড়ীতে শরৎচন্দ্রের বড়ই সুখে শান্তিতে দিন কাটিতে লাগিল। এ যেন তাঁহার নিজ বাড়ী আর অঘোরবাবু এবং তাঁহার স্ত্রী যেন তাঁহার মাতাপিতা। মাতাপিতার নিকট তিনি যেমন স্নেহ ও আদর পাইতেন, মেশো মহাশয় ও মাসীমার নিকট তাহা হইতে কিছু কম পাইলেন না। পূর্ব্বে আত্মীয় স্বজনদিগের দুর্ব্যবহারে তিনি জীবনে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এবার মেশো মহাশয় ও মাসীমার স্নেহময় সদয় ব্যবহারে তাহা তিনি ভুলিয়া গেলেন।

অঘোরবাবু শরৎচন্দ্রের জন্য একটা ভাল চাকরীর ব্যবস্থা করিলেন। কথাটা শুনিয়া শরৎচন্দ্রের হৃদয় কৃতজ্ঞতা ও আনন্দে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু ভগবান্ যে তাঁহার জন্য অন্য ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা তখন শরৎচন্দ্র বুঝিতে পারেন নাই।

শরৎচন্দ্র যে দিন চাকরীতে বসিবেন তাহার পূর্ব্বের সপ্তাহেই অঘোরবাবু সহসা পরলোক গমন করিলেন। শরৎচন্দ্রের সমস্ত আশা ভরসা নির্ম্মূল হইয়া গেল। তিনি চারিদিকে নিরাশার ঘন কুজ্ঝটিকা দেখিতে পাইলেন। তাঁহার কি যে হইবে তাহা ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়িলেন।

অঘোরবাবুর রেঙ্গুনে বড় লোক বলিয়া খ্যাতি ছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর দেখা গেল, ঋণের দায়ে তাঁহার আকণ্ঠ নিমজ্জিত। অঘোরবাবুর মৃত্যুর পরেই পাওনাদারেরা দলে দলে আসিয়া তাগাদা আরম্ভ করিয়া দিল। কেহ কেহ আদালতে নালিশ রুজু করিয়া

দিল। দেনা শোধের কোনও উপায় নাই। স্বামীর মৃত্যুতে অঘোরবাবুর স্ত্রী একে শোকাচ্ছন্ন তাহার উপর আবার পাওনাদারদের উৎপীড়ন। তিনি চোখে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। যাহাতে তিনি তাঁহার দামী দামী জিনিষ ও গহনাপত্র লইয়া পলাইয়া যাইতে না পারেন সেই জন্য কোনও কোনও পাওনাদার কড়া নজর পর্য্যন্ত রাখিয়াছিল। এই বিপদে মাত্র শরৎচন্দ্র ছিলেন তাঁহার একমাত্র সহায় এবং ভরসা।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শরৎচন্দ্র অবশেষে এক উপায় স্থির করিলেন। তিনি স্থির করিলেন, কোনও রকমে অঘোরবাবুর স্ত্রীকে তাঁহার দামী জিনিষ ও গহনাপত্র সহ বাংলাদেশে গোপনে পাঠাইয়া দিবেন, যাহাতে পাওনাদারেরা আর তাঁহাকে ধরিতে না পারে। তিনি অঘোরবাবুর স্ত্রীকে রাতারাতি সব গুছাইয়া লইতে বলিলেন। জিনিষপত্র ও গয়নাগাটি সমস্ত গুছান হইয়া গেলে শরৎচন্দ্র রাত্রির অন্ধকারে সকলের অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে বাঙ্গালাদেশগামী জাহাজে তুলিয়া দিয়া আসিলেন।

এইবার শরৎচন্দ্র আবার নিরাশ্রয় হইলেন। পথই একমাত্র আশ্রয়স্থান হইল। মেশোমহাশয়ের বাড়ীতে তিনি যে শান্তির নীড় রচনা করিয়াছিলেন, বিধাতার চক্ষে তাহা সহ্য হইল না। আচম্বিতে একটা দমকা হাওয়ায় তিনি সেই সুখের নীড় ভাঙ্গিয়া উড়াইয়া দিলেন। শরৎচন্দ্র এখন কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, কিরূপে তাঁহার দুই মুষ্টি আহার জুটিবে ইহাই হইল তাঁহার প্রধান চিন্তা।

কিছুদিন কোনও প্রকারে রেঙ্গুনে কাটাইয়া যখন দেখিলেন, রেঙ্গুনে থাকা আর তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন তিনি চলিয়া

গেলেন উত্তর-ব্রহ্মে। তখন বর্ম্মী ভাষাও তিনি বেশ শিখিয়া লইয়াছিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুর ছদ্মবেশে তিনি ইচ্ছামত নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অনেকদিন এইভাবে কাটাইয়া তিনি আবার রেঙ্গুনে ফিরিয়া আসিলেন।

এবার তাঁহার একটা চাকরী জুটাইয়া না লইলেই নয়। ১৯০৫ সালে রেঙ্গুণ একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল আফিসে তাঁহার একটা চাকরী জুটিয়া গেল। সেই চাকরিটি করিয়া দিয়াছিলেন এম, কে, মিত্র নামে এক সদাশয় ভদ্রলোক। শরৎচন্দ্র যখন বাউল বেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন মিত্র মহাশয় শরৎচন্দ্রের গান শোনেন। সেই হইতে তাঁহার সহিত শরৎচন্দ্রের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। পরে শরৎচন্দ্রের নিকটে তাঁহার রেঙ্গুন আগমনের কারণ অবগত হইয়া তিনি স্বেচ্ছায় তাঁহাকে এই চাকরিটি জুটাইয়া দেন।

এই চাকরী পাইবার পূর্ব্বে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত শরৎচন্দ্র বর্ম্মায় ছন্নছাড়া জীবন কাটাইয়াছিলেন। এইবার চাকরিটি পাইয়া তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন। মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতেই শরৎচন্দ্র দিন কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত শরৎচন্দ্রের বেশ বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিল। মিত্র মহাশয় ছিলেন একজন সুপণ্ডিত লোক, পড়াশুনায়ও তাঁহার অনুরাগ যথেষ্ট। শরৎচন্দ্রও এই পড়াশুনায় যোগ দিলেন। দুই বন্ধুতে মিলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের রচিত দর্শনশাস্ত্র, সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতি পাঠ করিতেন এবং সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।

'বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাব' নামে সে সময়ে রেঙ্গুনে তথাকার প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের একটা ক্লাব ছিল। রেঙ্গুনপ্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে

প্রায় অনেকেই ছিলেন সেই ক্লাবের সভ্য। শরৎচন্দ্রও এই ক্লাবে যোগদান করিলেন। সেখানে যে গানের আসর বসিত শরৎচন্দ্র একাই তাঁহার সুকণ্ঠের সঙ্গীতের গুণে সেই আসর মাতাইয়া তুলিতেন। তাঁহার কণ্ঠে বাঙ্গালা দেশের প্রাচীন কবিদের গান, কীর্ত্তন এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনিয়া ক্লাবের শ্রোতারা মুগ্ধ হইয়া যাইত। শরৎচন্দ্রের সঙ্গীত না হইলে সেদিন ক্লাবের আসর মোটেই জমিত না। এইরূপে অল্প দিনের মধ্যেই শরৎচন্দ্র ক্লাবের একজন সর্ব্বপ্রধান নেতা হইয়া উঠিলেন।

এই সময় কবিবর নবীনচন্দ্র সেন রেঙ্গুনে আসিলেন। বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবের সভ্যগণ তাঁহার যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করিলেন। উদ্বোধন সঙ্গীত গাহিবার ভার পড়িল শরৎচন্দ্রের উপর। শরৎচন্দ্র গানটি গাহিয়াই সভা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। নবীনচন্দ্র শরৎচন্দ্রের গানে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি শরৎচন্দ্রের সহিত আলাপ করিতে চাহিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

সম্মান বা যশের আকাঙ্ক্ষা শরৎচন্দ্রের কোনও দিনই ছিল না। হৈচৈ করিয়া সম্মান কুড়াইয়া বেড়াইতে তিনি কোনও দিনই পারিতেন না। নীরবে কিছু সত্যকার কাজ করিয়া যাওয়াই ছিল তাঁহার চিরন্তন স্বভাব। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল, সত্য কিছু দিয়া যাইবার জন্য তিনি সারাজীবন সাধনা করিয়া যাইবেন, ইহাতে যশোলাভ ভাগ্যে ঘটে ঘটুক, না ঘটে না ঘটুক।

এমন সময়ে রেঙ্গুনে প্লেগ দেখা দিল। প্লেগের ভয়ে অনেকেই শহর পরিত্যাগ করিয়া দূর পল্লীগ্রামে পলাইতে লাগিল। শরৎচন্দ্র

যে বাড়ীতে ছিলেন সেই বাড়ীর কর্ত্তা মিত্র মহাশয়ও বাড়ী ছাড়িয়া দূরে চলিয়া গেলেন। শরৎচন্দ্রকেও তাই উঠিয়া যাইতে হইল আফিসের একটা মেসে।

সেই মেসে বঙ্গচন্দ্র নামে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি ইংরেজীতে এবং দর্শনশাস্ত্রে একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। দর্শন সম্বন্ধীয় তাঁহার বহু চিন্তাশীল রচনা তখন রেঙ্গুমে ইংরেজি পত্রিকা সমূহে বিশেষ প্রশংসার সহিত প্রকাশিত হইত। এই বঙ্গচন্দ্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের নিবিড় ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইল। উভয়েই উভয়কে আপন ভাইএর মত ভালবাসিতেন।

একদিন বঙ্গচন্দ্র ভয়ানক রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। শরৎচন্দ্র দিনরাত তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। সেই সেবায় স্বার্থ ছিল না,—কুণ্ঠা ছিল না, কৃপণতা ছিল না। মা যেমন করিয়া রুগ্ন পুত্রের সেবা করে, তেমনই সেবা। কিন্তু এত সেবা করিয়াও শরৎচন্দ্র বন্ধুকে যমের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন না। একদিন শরৎচন্দ্রের কোলে মাথা রাখিয়া তাঁহার একটি হাত পরম আত্মীয়ের মত আঁকড়াইয়া ধরিয়া বঙ্গচন্দ্র প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। বন্ধুর মৃত্যুতে শরৎচন্দ্রের হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল, চোখ দিয়া বেদনার অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি স্থির পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় বন্ধুর প্রাণহীন দেহ কোলে করিয়া বসিয়া রহিলেন।

বন্ধুর মৃত্যুর পর সেই মেসে থাকা আর শরৎচন্দ্রের ভাল লাগিল না। তিনি সেই মেস ছাড়িয়া দিয়া আসিয়া বাসা বাঁধিলেন শহরের আর একখানি নির্জ্জন ঘরে।

সেই ঘরটিতে আসিয়া শরৎচন্দ্র গান-বাজনার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ শেষ করিয়া দিলেন। তিনি আবার তাঁহার লেখার খাতা খুলিয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিলেন।

এইবার শরৎচন্দ্রের জীবনে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল। শরৎচন্দ্র যে ঘরে বাসা লইয়াছিলেন, তাঁহার নীচের তলায় থাকিত একজন মিস্ত্রি,—বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ,—উপাধি চক্রবর্ত্তী। সংসারে তাহার মাত্র একটি কন্যা। কন্যার বিবাহের বয়স হইয়াছিল, কিন্তু অর্থাভাবে বিবাহ দিতে পারিতেছিল না। চক্রবর্ত্তীর চরিত্র ভাল ছিল না। সে নেশা করিত, আর যত সব অসৎ চরিত্রের লোক ছিল তাহার বন্ধু। তাহারা প্রায়ই আসিয়া চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে আড্ডা দিত ও হল্লা করিত। চক্রবর্ত্তী মেয়েটিকে দিয়া অনবরত ফরমাস খাটাইত, তাহার উপর আবার তাহাকে মার-ধর করিত। মেয়েটি নীরবে মুখ বুজিয়া সবই সহ্য করিয়া যাইত।

একদিন অনেক রাত্রে শরৎচন্দ্র বাড়ী ফিরিয়া ঘরে ঢুকিতে গিয়া দেখেন, ঘরের কপাট ভিতর হইতে বন্ধ রহিয়াছে। শরৎচন্দ্র দরজা ধাক্কাইয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন, কিছুক্ষণ পরেই দরজা খুলিয়া গেল। শরৎচন্দ্র দেখিলেন, চক্রবর্ত্তীর মেয়েটি ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। মেয়েটিকে অমন অবস্থায় দেখিয়া তিনি বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলেন। মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার কি হইয়াছে? সে কাঁদিতেছে কেন?

মেয়েটি যাহা বলিল, তাহার সার কথা এই যে, চক্রবর্ত্তী তাহার মেয়েটিকে জোর করিয়া বিবাহ দিতে চায় তাহারই এক মাতাল বন্ধু ঘোষালের সঙ্গে। ঘোষালের বয়স পঞ্চাশের উপর। আজ সেই

ঘোষাল আসিয়া তাহার বউ বলিয়া নেশার ঝোঁকে মেয়েটিকে ধরিয়া নিতে চায়।

শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ব্যবহারের কথা শুনিয়া রাগে দুঃখে অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ভাবিলেন, তাহার পর মেয়েটিকে সেই রাত্রের মত ঐ ঘরে শুইতে বলিয়া তিনি অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

পরের দিন চক্রবর্ত্তীকে নিজের ঘরে ডাকিয়া আনিয়া ধমকাইয়া বলিলেন,—"তোমার হইয়াছে কি? টাকার লোভে মেয়েটাকে ঐ বুড়ো মাতালটার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে মেয়েটার সর্ব্বনাশ করতে চাইছো?"

চক্রবর্ত্তী বলিল, "মেয়ের বিয়ের বয়স হ'য়েছে, বিয়ে দিতেই হবে। তা ঘোষাল মন্দ পাত্র কিসে? বেশ টাকা কড়ি আছে, মেয়েটা খেয়ে প'রে সুখে থাকবে।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন,—"বাঃ, চমৎকার পাত্র! মাতাল, জুয়াড়ী। আর ঘোষালের বয়স কি কম?—তোমার চাইতেও ত সে বয়সে বড় হবে!...তার চাইতে মেয়েটাকে গলা টিপে মেরে ফেলে দাও, দু'জনেই শান্তি পাবে।"

চক্রবর্ত্তী হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া বলিল,—"তুমিও ত বামুন, অত যদি আমার মেয়ের দুঃখে তোমার প্রাণ কেঁদে থাকে, তবে মেয়েটাকে তুমিই বিয়ে করে বামুনের কুল-মান বাঁচাও না।"

চক্রবর্ত্তীর কথাটা শুনিয়া শরৎচন্দ্র কি যেন ভাবিলেন। তারপর বলিলেন, "তা, যদি শেষ পর্য্যন্ত করতেই হয়, তবে করা যাবে।"

* * * *

শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু শরৎচন্দ্রকে এই মেয়েটিকেই বিবাহ করিতে হইল।

পরের দুঃখে কাতর হইয়াই দায়ে পড়িয়া উদাসী ছন্নছাড়া শরৎচন্দ্র সংসারের বন্ধনে বাঁধা পড়িলেন। সন্ন্যাসী ভবঘুরে শিল্পী হইলেন গৃহী।

এই ছোট সংসারটি পাতিয়া শরৎচন্দ্র জীবনে যেন এইবার শান্তির আস্বাদ পাইলেন। তিনি পড়াশুনা ও লেখা লইয়া ব্যস্ত হইলেন।

কিছুদিন পরে শরৎচন্দ্রের একটি ছেলে হইল। তিনি সংসারে আরও বিশেষ করিয়া জড়াইয়া পড়িলেন। এই ছেলেই যেন তাঁহাকে সংসার-মায়ায় আরও বেশী করিয়া মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। শরৎচন্দ্র অবসর সময়ে ছেলেকে কোলে লইয়া কত কথা বলেন, কত কথা ভাবেন,—মনে মনে কত কল্পনার জাল বোনেন। কত রঙীন কল্পনায় তাঁহার প্রাণখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

ভগবান্ বোধহয় উপর হইতে শরৎচন্দ্রের এত সুখ, এত শান্তি দেখিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন।

এমন সময়ে রেঙ্গুণে আবার ভয়ঙ্কর প্লেগ দেখা দিল।

লোকেরা শহর ছাড়িয়া বাড়ী ছাড়িয়া দূরে ফাঁকা যায়গায় পলাইতে লাগিল। শরৎচন্দ্রও স্ত্রীপুত্র লইয়া দূরে পলায়নের আয়োজন করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার স্ত্রীপুত্র উভয়েই প্লেগে আক্রান্ত হইল। দেখিতে দেখিতে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সব শেষ হইয়া গেল। শরৎচন্দ্রের কোলেই মাথা রাখিয়া তাঁহার স্ত্রী-পুত্র এক সঙ্গে পরলোকের পথে যাত্রা করিল। শরৎচন্দ্র চোখের কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু দিয়া তাহাদের শেষ বিদায় দিলেন।

স্ত্রী-পুত্রের স্মৃতি বিজড়িত গৃহ শরৎচন্দ্রের আর ভাল লাগিল না। কত কথাই মনে পড়িয়া যেন তাঁহার হৃদয়কে আকুল ও ব্যথাতুর করিয়া তুলিত। তাই তিনি আর সেই বাড়ীতে বাস করিতে পারিলেন না। বাধ্য হইয়া বাসা বদল করিলেন।

কিন্তু তাহাতেও আর তিনি তাঁহার আগেকার মনের শান্তি আর ফিরিয়া পাইলেন না; সবই যেন তাঁহার কাছে আনন্দলেশশূন্য ফাঁকা ফাঁকা মনে হইতে লাগিল। কোনও কাজে কর্ম্মে তাঁহার মন বসে না। লিখিবার জন্য খাতা খুলিয়া বসেন, কিন্তু লেখা কিছুতেই আসে না।

এইরূপে কিছুদিন কাটাইয়া অবশেষে তিনি ঘরের তালা চাবি বন্ধ করিয়া দেশ-ভ্রমণের সঙ্কল্প লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

এগার

শরৎচন্দ্র এইবার একবার বাংলায় আসিয়াছিলেন। তখন তিনি তাঁহার ভাইবোনদের সংবাদ লন এবং তাহাদের কাহারও কাহারও ব্যবস্থা করিয়া যান। তখন তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা প্রভাসচন্দ্র সন্ন্যাসী হইয়া বেলুড়মঠে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়াছেন। ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্রের জলপাইগুড়িতে থাকার নানা প্রকার অসুবিধা হইতেছিল, তাই তাহাকে অগ্রদ্বীপে রাখিয়া আসিলেন। তাহার পর ভগিনীদিগের সঙ্গে দেখা করিয়া তিনি আবার রেঙ্গুন যাত্রার সঙ্কল্প করেন। এই সময়ে তিনি হিরণ্ময়ী দেবী নাম্নী এক দরিদ্রা অসহায়া ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করেন।

নববিবাহিতা পত্নীকে লইয়া শরৎচন্দ্র আবার রেঙ্গুনে ফিরিয়া আসিলেন।

রেঙ্গুনে আসিয়া শরৎচন্দ্র একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া আবার সংসার রচনা করিলেন। বাড়ীখানা তিনি মনের মতন করিয়া সাজাইলেন নানারকম ফুলের গাছের টব দিয়া। তিনি একটি নুরী পাখী কিনিলেন, তাহার নাম রাখিলেন আদর করিয়া 'বাটুবাবা'। বাটুকে শরৎচন্দ্র অনেক যত্নে কথা বলিতে শিখাইলেন। বাটু সুন্দর কথা বলিতে পারিত। বাটুর যত্নই বা কত! রূপার দাঁড়, পায়ে সোনার শিকল।

আফিস হইতে আসিয়া শরৎচন্দ্র ফুল গাছের পরিচর্য্যা করেন,

বাটুর সঙ্গে কথা বলেন, স্ত্রী হিরণ্ময়ীর সঙ্গে গল্প বলেন। হিরণ্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্র ডাকিতেন 'বড়বৌ' বলিয়া।

শরৎচন্দ্রের ফুলের গাছ ফুলে ভরিয়া উঠিল, তখন তাঁহার মনে আর আনন্দ ধরে না। এইরূপে যখন তাঁহার মনের শান্তি আবার ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি আবার লেখা-পড়ায় মন দিলেন। ছবি আঁকা তিনি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, আবার ছবি আঁকা আরম্ভ করিলেন। হিরণ্ময়ী দেবীর ভালবাসা ও সেবা-যত্নে শরৎচন্দ্রের দিনগুলি বেশ আনন্দ ও শান্তিতেই কাটিতে লাগিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্য বোধহয় শরৎচন্দ্রের পশ্চাতে লাগিয়াই ছিল। এক গভীর রাত্রে যখন সকলেই গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত, তখন হঠাৎ শরৎচন্দ্রের নীচের তলায় এক ধোপার ঘরে সহসা আগুন ধরিয়া গেল। সেই আগুন ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভ করিয়া উপর তলাকে গ্রাস করিল। লোকজনের চীৎকারে শরৎচন্দ্র জাগিয়া উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহারা আগুনের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। এই অবস্থায় তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তিনি তাড়াতাড়ি স্ত্রী ও পাখীটাকে নীচে নামাইয়া আনিলেন। তাহার পর তাঁহার মনে পড়িল, স্ত্রীর অলঙ্কার, বই, লেখার খাতা ও ছবির কথা। তিনি তৎক্ষণাৎ আবার উপরে উঠিয়া গেলেন। একটা বাক্সে কিছু বই-পত্র ও হিরণ্ময়ী দেবীর অলঙ্কারগুলি গুছাইয়া লইয়া যখন নীচে নামিবার জন্য সিঁড়ির কাছে আসিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন, সিঁড়ির কতকটা অংশ আগুনে জ্বলিয়া খসিয়া পড়িতেছে। নীচে যে নামিয়া আসিবেন সে উপায়ও নাই। দাউ দাউ করিয়া তখন তাঁহার চারিদিকে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়াইয়া পড়িতেছে। শরৎচন্দ্র তখন আর অন্য

উপায় না দেখিয়া হাতের বাক্স ফেলিয়া দিয়া আগুনের মধ্য দিয়াই লাফাইয়া নীচে পড়িয়া গেলেন।

শরৎচন্দ্র ত নিজের জীবন লইয়া কোনও প্রকারে নীচে আসিলেন, কিন্তু তাঁহার বই, ছবি, লেখা, পাণ্ডুলিপি এবং হিরণ্ময়ী দেবীর অলঙ্কারগুলির জন্য তাঁহার মন বড়ই খারাপ হইয়া গেল।

শরৎচন্দ্র আগুনের দিকে চাহিয়া ভারী গলায় বড়ই আক্ষেপের সুরে বলিলেন,—"বড় বৌ, আমার বহু যত্নের বই, 'মহাশ্বেতা' লেখার খাতা, সবই যে গেল!"

শরৎচন্দ্র আবার নূতন বাসা করিলেন।

রেঙ্গুন হইতে তাঁহার এক বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যকে এক খানা পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রে আমরা শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুন জীবনের কতকটা পরিচয় পাই। পত্রখানা এইরূপ :—

"প্রমথ,

আমার সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিয়াছ। তাহা সংক্ষেপে কতকটা এইরূপ,—শহরের বাহিরে একখানা ছোট বাড়ীতে নদীর ধারে থাকি। চাকরি করি। ৯০৲ টাকা মাহিনা পাই এবং ১০৲ টাকা এলাউয়েন্স পাই। একটা ছোট দোকানও আছে। দিনগত পাপক্ষয়, কোনও মতে কুলাইয়া যায়, এই মাত্র। সম্বল কিছুই নাই। হৃদ্‌রোগ আছে। যে কোনও মুহূর্ত্তেই শেষ হইতে পারি। পড়িয়াছি বিস্তর, প্রায় কিছুই লিখি নাই। গত দশ বৎসর শরীর-বিদ্যা, প্রাণি-বিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, এবং কিছু ইতিহাস পড়িয়াছি। শাস্ত্রও কিছু পড়িয়াছি। আগুনে পুড়িয়াছে আমার সমস্তই। লাইব্রেরী এবং "চরিত্রহীনের" পাণ্ডুলিপি, "নারীর ইতিহাস" প্রায় ৪০০।৫০০ পাতা

লিখিয়াছিলাম, তাহাও গিয়াছে। ইচ্ছা ছিল যা হোক একটা এ-বৎসরে প্রকাশ করিব। আমার দ্বারা কিছু বোধ হয় হইবার নয়, তাই সব পুড়িয়াছে। আবার সুরু করিব এমন উৎসাহ পাই না। "চরিত্রহীন" ৫০০ পাতায় প্রায় শেষ হইয়াছিল। সবই গেল···। একটা সংবাদ তোমাকে দিতে বাকি আছে। বছর তিনেক আগে যখন হৃদ-রোগের প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন পড়া ছাড়িয়া তৈলচিত্র অঙ্কন সুরু করি। গত তিন বৎসর অনেকগুলি তৈলচিত্র সংগ্রহ হইয়াছিল, তাহাও ভস্মসাৎ হইয়াছে। শুধু আঁকিবার সরঞ্জামগুলি বাঁচিয়া গিয়াছে। এখন আমার কি করা উচিত যদি বলিয়া দাও ত, তোমার কথামত দিন কতক চেষ্টা করিয়া দেখি। উপন্যাস, ইতিহাস, ছবি আঁকা,—কোনটা! কোনটা আবার সুরু করি বলত!

—তোমার স্নেহের শরৎ।"

শরৎচন্দ্রের 'মন্দির' নামক গল্পটিই সর্ব্বপ্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়। একবার বন্ধুদের হারমোনিয়াম কিনিবার টাকার অভাব হওয়ায় 'কুন্তলীন পুরস্কারের' জন্য ইহা লিখিত হইয়াছিল। ১৩১০ সালের ভাদ্রমাসে তাহা প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই গল্পটি তিনি নিজের নামে প্রকাশ করেন নাই, প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার বন্ধু এবং মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে। গল্পটি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পঁচিশ টাকা পুরস্কার লাভ করে।

১৩১৪ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের অল্প বয়সের লেখা 'বড় দিদি' প্রকাশিত হইয়া পাঠকদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাহা

পড়িয়া সকলেই মনে করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথই ছদ্ম নামে এই গল্পটি লিখিয়াছেন। অনেকে রবীন্দ্রনাথকে এই জন্য পত্র পর্য্যন্ত লিখিয়াছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সকলকে জানান যে, গল্পটি তাঁহার লেখা নহে। বাংলা দেশে যখন এই গল্পটি লইয়া সাহিত্যিক মহলে তুমুল আন্দোলন ও আলোচনা চলিতেছিল, শরৎচন্দ্র তখন কিন্তু ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারেন নাই। কারণ শরৎচন্দ্র নিজে উহা ছাপিবার জন্য পাঠান নাই, পাঠাইয়াছিলেন শরৎচন্দ্রের অজ্ঞাতে তাঁহারই এক বন্ধু।

১৯১২ সালের শেষের দিকে একবার শরৎচন্দ্র ছুটি লইয়া রেঙ্গুণ হইতে সপরিবারে কলিকাতায় বেড়াইতে আসিলেন। তখন মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটে চিৎপুরের মোড়ে একটা বাড়ীতে তিনি থাকিতেন। তখন শরৎচন্দ্রের কোনও নামযশ হয় নাই। সাধারণ লোকে তাঁহাকে চিনিতই না। তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেই তাঁহার সাহিত্যিক খ্যাতি সীমাবদ্ধ ছিল।

শরৎচন্দ্র কলিকাতায় আসিবার পর তাঁহার বন্ধু-বান্ধবেরা সকলে তাঁহার বাড়ীতেই আড্ডা জমাইতে লাগিলেন। সেই সময়ে কলিকাতায় গোটাকয়েক সাহিত্য মজলিস ছিল। গোটা কয়েক নূতন মাসিক পত্রিকা বাহির হইয়াছিল, আর কয়েকটা বাহির করার যোগাড়-যন্ত্র চলিতেছিল। এই সমস্ত মাসিক পত্রিকা ও সাহিত্যিক আড্ডার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন শরৎচন্দ্রের কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব। যে সমস্ত সাহিত্যিক আড্ডা বসিত তাহাতে সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা এবং তর্কবিতর্ক হইত, শরৎচন্দ্র নীরবে বসিয়া তাহা শুনিতেন।

রবীন্দ্রনাথকে শরৎচন্দ্র বরাবরই গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। শরৎচন্দ্রের নিজের কথাতেই তাহা ব্যক্ত হইতেছে—

"দীর্ঘকাল কাটলো প্রবাসে, ইতিমধ্যে কবিকে কেন্দ্র ক'রে কি ক'রে নবীন বাংলা সাহিত্য দ্রুতবেগে সমৃদ্ধিতে ভ'রে উঠলো, আমি তার কোন খবরই জানিনে। কবির সঙ্গে কোন দিন ঘনিষ্ঠ হবারও ভাগ্য ঘটে নি, তাঁর কাছে ব'সে সাহিত্যের শিক্ষা গ্রহণেরও সুযোগ পাই নি, আমি ছিলাম একেবারে বিচ্ছিন্ন ; এইটা হ'লো বাইরের সত্য, কিন্তু অন্তরের সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই বিদেশে ছিল আমার সঙ্গে কবির খান কয়েক বই, কাব্য ও সাহিত্য এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ওই ক'খানা বই-ই বার বার ক'রে প'ড়েছি।······শুধু প্রত্যয়ের আকারে মনের মধ্যে এইটুকু ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছুই হতে পারে না। কি কাব্যে, কি কথা-সাহিত্যে, আমার ছিল এই পুঁজি।"

যে সমস্ত সাহিত্যিক আড্ডা বসিত, সেই আড্ডায় শরৎচন্দ্রের বন্ধুরা তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন, কিছু লেখার জন্য। শরৎচন্দ্র নিজের মুখে এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"আমার গুটি কয়েক পুরাতন বন্ধু একটি ছোট মাসিকপত্র বের করতে উদ্যোগী হ'লেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান লেখকদের কেউই এই সামান্য পত্রিকায় লেখা দিতে রাজি হ'লেন না। নিরুপায় হ'য়ে তাঁরা কেউ কেউ আমায় স্মরণ করলেন। বিস্তর চেষ্টায় তারা আমার কাছে থেকে লেখা পাঠাবার কথা আদায় ক'রে নিলেন। এটা ১৯১৩ সালের কথা। আমি নিমরাজি হ'য়ে ছিলাম। উদ্দেশ্য

কোন রকমে একবার দূর রেঙ্গুণে পৌঁছাতে পারলে হয়। কোন রকমে তাঁদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যেই আমি লেখা দিতে স্বীকৃত হয়েছিলাম। কিন্তু চিঠির পর চিঠি আর টেলিগ্রামে তাড়া আমাকে অবশেষে সত্য সত্যই আবার কলম ধরতে প্ররোচিত ক'রল। আমি তাঁদের নবপ্রকাশিত 'যমুনার' জন্য একটি ছোট গল্প পাঠালাম। এই গল্পটি প্রকাশ হ'তে না হ'তেই বাংলার পাঠক সমাজে সমাদর লাভ ক'রল। আমিও এক দিনেই নাম ক'রে বসলাম।"

'যমুনায়' চরৎচন্দ্রের যে গল্পটি বাহির হইয়াছিল, তাহার নাম 'রামের সুমতি'। ইহার পূর্ব্বে যমুনাতেই শরৎচন্দ্রের ছেলে বেলার লেখা 'বোঝা' নামে একটি গল্প বাহির হইয়াছিল। কিন্তু 'রামের সুমতি' বাহির হইবার পর বাংলার সাহিত্যিক সমাজে ও সাধারণের মধ্যে মহা আনন্দ ও আন্দোলন আরম্ভ হইয়া গেল; রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত যে এত চমৎকার গল্প কেহ লিখিতে পারে সেই ধারণা কাহারও ছিল না। এই একটি গল্প লিখিয়াই শরৎচন্দ্র সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন।

ঠিক এই সময়েই সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত মাসিক পত্র 'সাহিত্যে' শরৎচন্দ্রের লেখা 'বাল্যস্মৃতি', 'কাশীনাথ', প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। এইগুলি শরৎচন্দ্র নিজে ছাপিতে পাঠান নাই। ইহা তাঁহার বন্ধু ও মাতুল উপেন্দ্রনাথের কাণ্ড।

ইহার পর 'যমুনা' পত্রিকায় বাহির হয় শরৎচন্দ্রের 'পথ-নির্দ্দেশ' আর 'বিন্দুর ছেলে'। দেখিতে দেখিতে শরৎচন্দ্রের অপূর্ব্ব সৃষ্টি-প্রতিভার হিরণ জ্যোতি ছড়াইয়া পড়িল চতুর্দ্দিকে। সকলের মুখেই শরৎচন্দ্রের কথা।

শরৎচন্দ্র তখন রেঙ্গুণে। নদীর তীরে ছোট একখানি বাড়ী, উপর তলায় নিজে সস্ত্রীক থাকেন, নীচের তলায় তাঁহারই নিজের একখানা ছোট মনোহারী দোকান, সেই দোকানে তিনি নিজেই বেচা-কেনা করেন, আর দুপুরে অফিস করিতে হয়। রাত্রে প্রকৃতি যখন নিস্তব্ধ হইয়া পড়ে তখন তিনি স্তিমিত আলোকের সম্মুখে নিজের লেখার খাতাটি খুলিয়া বসেন। খাতার পাতায় পাতায় সুন্দর অক্ষরে তিনি বুনিয়া যান কত কল্পনার জাল। রাতের পর রাত এমনি অব্যাহত গতিতে চলিতে লাগিল তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টি। এখন তাঁহার হৃদয়ে উৎসাহের অন্ত নাই। তাঁহাকে একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হইতে হইবে, তাঁহার অন্তরে তখন জাগিতেছিল এই আকাঙ্ক্ষা।

দেখিতে দেখিতে 'যমুনায়' শরৎচন্দ্রের 'চন্দ্রনাথ', নারীর মূল্য' ও 'আঁধারে আলো' প্রকাশিত হইল। এই সময় বড় বড় কাগজ-ওয়ালারা শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষ' তখন বাহির হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধু প্রমথনাথ এই সময় 'ভারতবর্ষের' একজন অন্যতম প্রধান কর্ণধার। তিনি শরৎচন্দ্রকে পুনঃ পুনঃ 'ভারতবর্ষের' জন্য লেখা পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণ নীরব রহিলেন। অবশেষে শরৎচন্দ্র প্রমথনাথের চিঠির তাগিদে টিকিতে না পারিয়া তাঁহাকে একখানা পত্র দিলেন। পত্রখানা এইরূপ :—

"প্রমথ,—একটা অহঙ্কার করব মাপ করবে ? যদি করতে বলি। আমার চেয়ে ভালো উপন্যাস বা গল্প এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ

লিখতে পারবে না, যখন এই কথাটা মনে জ্ঞানে সত্য বলে মনে হবে, সেইদিন প্রবন্ধ বা গল্প বা উপন্যাসের জন্য অনুরোধ কোরো। তার পূর্ব্বে নয়। এই আমার এক বড় অনুরোধ তোমার উপরে রইল। এ বিষয়ে আমি অসত্য খাতির চাই না, আমি সত্য চাই।”

প্রমথনাথ কিন্তু শরৎচন্দ্রের এই পত্র পাইয়াও নিরস্ত হইলেন না। তিনি শরৎচন্দ্রকে পূর্ব্বের মতই লেখা পাঠাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ-পত্র দিতে লাগিলেন। শরৎচন্দ্র অবশেষে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশের জন্য তাঁহার নূতন করিয়া লেখা 'চরিত্রহীনের' পাণ্ডুলিপির কতকটা পাঠাইয়া দিলেন। প্রমথনাথের বিশেষ ইচ্ছা থাকিলেও 'ভারতবর্ষের' কর্ত্তৃপক্ষ উহা ছাপিতে সম্মত না হওয়ায় পরে উহা 'যমুনায়' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিল।

'ভারতবর্ষে' শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ' প্রকাশিত হইল।

যমুনার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল এই সময়ে শরৎচন্দ্রের 'বড় দিদি' পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলেন। 'বড় দিদির' জন্য শরৎচন্দ্র বন্ধুর নিকট হইতে এক পয়সাও গ্রহণ করেন নাই।

বার

১৯১৪ সালের শেষের দিকে শরৎচন্দ্র আবার কিছু দিনের জন্য কলিকাতায় আসিলেন।

তখন শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীরূপে আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার 'বিরাজ বৌ', 'বিন্দুর ছেলে', 'পরিণীতা', 'পণ্ডিত মশাই' প্রভৃতি পুস্তকগুলি ছাপা হইয়া সর্ব্বসাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জন করিয়াছে। শরৎচন্দ্রকে এখন সকলেই চিনে।

কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া শরৎচন্দ্র আবার রেঙ্গুণে ফিরিয়া গেলেন।

রেঙ্গুণে ফিরিয়াও শরৎচন্দ্র পুরাদমেই সাহিত্যসেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ১৯১৫ সাল হইতে ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত শরৎচন্দ্রের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। ডাক্তারেরা তাঁহাকে বর্ম্মা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে উপদেশ দেন।

এই সময় শরৎচন্দ্র তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের কলিকাতায় যে সব চিঠি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, শরৎচন্দ্র নিজের জীবন সম্বন্ধে কিরূপ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। একখানি পত্র এইরূপ—

"ভায়া, আমি এবার বড়ই বিপদে পড়িয়াছি। সুদূর হইতে প্রমথ ভায়ার বাতাস লাগিল কি না, বুঝিতে পারিতেছি না। এ আবার আরও খারাপ। এ শুনি বর্ম্মা দেশের ব্যারাম—দেশ না ছাড়িলে কোন দিন এও ছাড়ে না। তাই দুয়ের এক বোধ করি অনিবার্য্য হইয়া উঠিতেছে।

"কি জানি ভগবানই জানেন। ভয় হয়, হয়ত বা চিরজীবন পঙ্গু হইয়াই বা যাইব।...যদি অদৃষ্ট আমার চিরকালের মত ভাঙ্গিয়াও থাকে, তাহাও যদি ঠিক জানিতে পারি, তাহা হইলেও ধীরে ধীরে এই মহা দুঃখ বোধকরি সহিয়া যাইবে।...ছেলেবেলায় ভগবানকে বড় ভালবাসিতাম—মাঝে বোধকরি সম্পূর্ণ হারাইয়াছিলাম।

আবার শেষ বয়সে যদি তিনি দেখা দিতে আসেন,—তাই ভাল।"

আর একখানি পত্র এইরূপ—

"আমি পীড়িত—এখানে সারিবে বলিয়া আর ভরসা করি না। দেহের আর সমস্ত বজায় রাখিয়াও জগদীশ্বর আমাকে যদি পঙ্গু করিয়াই শাস্তি দেন—তাই ভাল।......আমি এক বৎসরের ছুটি লইয়াই যাইব। যে মেলের টিকিট পাইতে পারিব তাহাতেই চলিয়া যাইবার আন্তরিক বাসনা। আপনি আমাকে ৩০০্ টাকা পাঠাইয়া দিবেন।"

শরৎচন্দ্রের স্বাস্থ্যের অবস্থা যখন অত্যন্ত খারাপ তখন হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে মাসিক ১০০্ টাকা করিয়া সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

এক বৎসরের ছুটি লইয়া শরৎচন্দ্র ১৯১৬ সালের ১২ই এপ্রিল রেঙ্গুণ পরিত্যাগ করেন।

দীর্ঘ তের বৎসর ব্রহ্মদেশে বাস করিয়া অবশেষে শরৎচন্দ্র সেই দেশ পরিত্যাগ করিলেন।

তের

বাজে শিবপুরে একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া শরৎচন্দ্র সেখানে বাস করিতে লাগিলেন।

এখানে আসিয়া শরৎচন্দ্র ব্যাধি মুক্ত হইলেন। এবার তিনি কায়মনঃপ্রাণে সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার 'মেজ দিদি', 'দর্পচূর্ণ', 'পল্লীসমাজ', 'চন্দ্রনাথ' 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'অরক্ষণীয়া', 'শ্রীকান্ত', 'নিষ্কৃতি' প্রভৃতি গল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত হইতে লাগিল। পাঠক-সমাজ তাহা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইল।

শরৎচন্দ্রের যশ ও খ্যাতি প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আয়ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইল। এখন তাঁহার আয় মাসিক প্রায় পাঁচশত টাকা। কিন্তু শরৎচন্দ্র একদিন মাসিক একশত টাকা আয়ের উপরেই নির্ভর করিয়া রেঙ্গুণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রের স্বভাব কিংবা চাল-চলনের কোনও পরিবর্ত্তন হইল না। পূর্ব্বের মতই এখনও তিনি বন্ধুবৎসল, সদালাপী, নিরহঙ্কার ও নিরীহ মানুষ।

শরৎচন্দ্রের এই সময়কার সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শৈলেন্দ্রনাথ বিশী লিখিয়াছেন :—

"বাজে শিবপুরের একতলা একখানি ছোট কোঠা বাড়ী। হয়তো উপরে আর দুইখানি ঘর ছিল, তবে তাহার বাইরে থেকে একতলাই দেখায়। ছোট একটু আঙিনা, তাতে একটা পেয়ারা গাছ, উঠানে গোটা দুই ফুলের গাছ,—টগর ও শেফালী জাতীয়। বাড়ীতে কোনও শ্রী নাই, কোন শৃঙ্খলা নাই। উঠানে ঢুকেই

দেখতে পাওয়া যায়, বারান্দায় দাদার (শরৎচন্দ্রের) সাবেক কালের লম্বা হাতা ইজিচেয়ার। তার এক পাশে 'টিপয়'। অন্য পাশে ছোট টুলের উপর তাঁর লম্বা নল, গড়গড়া, তার পাশে একটা পিতলের পিক্‌দানী।

"ঘরে ঢুকতেই দেখতে পাওয়া যায় ঢালা ফরাস, চাদর সব সময় পরিষ্কার থাকতো না। গোটা দুই তাকিয়া। পাশে একটা খোলা বুক শেলফ্। তাতে তকতকে ঝক্‌ঝকে বাঁধান বই সাজানো, তিন থাক। তাতে সাহিত্য ছাড়া আর সবই ছিল, কঠিন গণিতের বই, বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র।......ঘরে গোটা চারেক কুলুঙ্গী ছিল। তার একটাতে ছিল, কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের নমুনা হিসাবে গৌর নিতাই-এর যুগল মূর্ত্তি।

"ফরাসের উপর ছিল, হাত দেড়েক লম্বা, অনুপাতে চওড়া, বর্ডারে দামী মেহগনী কাঠ—'এম্‌বস্' করা একখানি ঠাকুরবাড়ী মার্কা হাত-টেবিল। তাহার উপর ছিল দাদার লিখিবার প্যাড্। একটি ডীবের উপর 'শরৎ' এই কথাটি এম্‌বস্ করা। হাত-টেবিলের উপর ব্লটিং প্যাড্, সেটার চারপাশে মরক্কো দিয়ে বাঁধানো। দাদার (শরৎচন্দ্রের) জিনিসগুলো এতই দামী ছিল। সেই হাত-টেবিলের উপর একটি সুদৃশ্য কাঠের পাত্রে থাকতো ডজন খানেক, নানা আকারের, নানা ছাঁদের ফাউন্‌টেন্ পেন্, পার্কার হ'তে ওয়াটার ম্যান্ সব রকম এবং যখন যে ভাল ফাউন্‌টেন্ পেন বেরুতো তা। প্যাডের পাশে দুটো এ্যান্টি এ্যায়ার-ক্রাফট্ গানের মত মাথা উঁচু করে থাকতো ফাউন্‌টেন্ পেন-হোলডার। এই গেল দাদার পটভূমি। তখনকার দিনে অন্তরঙ্গ নিত্য সঙ্গী ছিল লোমশূন্য ভেলু কুকুর আর ভোলা চাকর।"

শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে তখন যে সব বন্ধুবান্ধব বেড়াইতে যাইতেন তাঁহাদিগের প্রতি শরৎচন্দ্রের আদর আপ্যায়নের অন্ত ছিল না। তাহার পর গল্পগুজবও কত চলিত। তাঁহার অতীত জীবনের কত সুখ-দুঃখের গল্প বলিয়া তাঁহাদিগকে শুনাইতেন।

শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে যে সব বন্ধুবান্ধবেরা যাতায়াত করিতেন তাঁহাদের সকলের মুখেই কুকুর ভেলু আর পাখী বেটুর গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে যাইতে হইলে ভেলু আর বেটুর সঙ্গে সদ্ভাব না রাখিয়া উপায় নাই। তাহা না হইলে শরৎচন্দ্র বড়ই অসন্তুষ্ট হইতেন। ভেলু যদি আসিয়া কামড়াইয়া দিত, তবে সেই কামড়ও নীরবে সহ্য করিতে হইত। কোনও প্রকার বিরক্তি প্রকাশের উপায় ছিল না। শরৎচন্দ্র তাঁহার পাখীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সেই ভালবাসা সম্বন্ধে শৈলেন্দ্রনাথ বিশী মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"আগেই বলেছি তাঁর বাড়ীর উঠানে একটা পেয়ারা গাছ ছিল। আষাঢ় কি শ্রাবণ মাস, আমি গিয়ে দেখি, গাছ ভরা পেয়ারা পেকে আছে। আমি আর লোভ সামলাতে না পেরে পেয়ারা পেড়ে নিলুম, একটা তখুনি খেতে লাগলুম, আর একটা পকেটে পুরলুম। শরৎ দা আমাকে পেয়ারা খেতে দেখে, ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চাকরকে গম্ভীর ভাবে বললেন,—"সব পেয়ারা পেড়ে ফেলো।" পেয়ারা পাড়া হ'লে আদেশ দিলেন,—"সব পেয়ারা পাড়ায় বিলিয়ে দাও।" আমি ভ্যাবাচাকা হয়ে গেলুম। কি অপরাধ করেছি বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। তিনি বললেন,—"তুমি না বলে কেন পেয়ারা পাড়লে? না হয় সব পেয়ারা তুমিই

নিয়ে যাও।” আমি বললাম,—“এ রকম অবিচার আমার প্রতি কেন করছেন? আমার যে কি অপরাধ তা তো বুঝতে পারলুম না!” তিনি বলিলেন,—“তা হ’লে দেখবে এসো।” এই বলে তিনি আমাকে ঘরের ভেতর নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি, তাকের ওপর চার পাঁচটা ছোট ছোট কাঁসার বাটি সাজানো। তার মধ্যে কোনটায় আছে বেদনার দানা, কোনটায় আনারসের টুকরা, কোনটায় পেস্তা, বাদাম, কিসমিস। তিনি বললেন,—“এসব বেটুর খাবার, ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেটু এসব খায়। বেটুর খাবার আগে এ বাড়ীর ফল কেউ খেতে পারে না। তুমি যখন তার আগে ফল খেয়েছো, তখন এগুলো পাড়ায় সব বিলিয়ে দিক গে।” আমিও সেই কথা শুনে আমার আধ-খাওয়া পেয়ারা ও পকেটে যেটা ছিল সেটা জান্‌লা গলিয়ে ফেলে দিলাম। উনি বেটুর কাছে গিয়ে ‘বাবা বেটু, বাবা বেটু’—ব’লে তার গায়ে হাত বুলিয়ে, ঠোঁটে চুমু খেয়ে, তার মাথাটি গালের সঙ্গে ঠেকিয়ে, যেমন ক’রে ছোট ছেলেকে আদর করে, সে রকম ক’রে আদর ক’রে, তাকে আস্ত আস্ত সব ফলগুলি খাওয়ালেন। তখন তাঁর মন শান্ত হ’লো।

শরৎচন্দ্রের হৃদয় ছিল মূক পশুপক্ষীর প্রতি এমনই দরদে পরিপূর্ণ। আর এই দরদ ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাঁহার সৃষ্ট সর্বশ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে। তাই তাঁহার সাহিত্য হইল দরদপূর্ণ, সহানুভূতি-পূর্ণ, মানবতার সাহিত্য।

শরৎচন্দ্রের দিনগুলি কাটিতে লাগিল পরম সুখে শান্তিতে। এখন তাঁহার যশ অর্থ কিছুরই অভাব নাই। এখন তিনি বাংলার সাহিত্যাকাশের একটি উজ্জ্বল সূর্য্য। যেখানেই সভা, সমিতি,

সাহিত্য-বৈঠক বসে সেখানেই শরৎচন্দ্রের নিমন্ত্রণ হয়। শরৎচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে যেন সেই সমুদয় সভা সমিতি অপূর্ণ থাকিয়া যায়। তাঁহার গৃহ সকল সময়েই জনসমাগমে পরিপূর্ণ। এক দিকে যেমন শরৎচন্দ্রের ভক্তের দলের অভাব নাই, তদ্রূপ আবার তাঁহার বিরুদ্ধ-বাদীর দলও ছিল। এই বিরুদ্ধবাদীর দল শরৎ-সাহিত্যে দুর্নীতির গন্ধ পাইয়া তাহার কঠোর সমালোচনা করিত। তাহারা এমন কথাও প্রচার করিত যে, শরৎচন্দ্রকে সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে সরিয়া যাইতে হইবে, নতুবা বাংলা সাহিত্যের চরম দুর্গতি হইবে, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্র আগাছা, জঙ্গল ও কণ্টকী লতায় পূর্ণ হইয়া উঠিবে। এইরূপে বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা শরৎচন্দ্র আক্রান্ত হইতেন।

একবার এই বিরুদ্ধবাদীদের কতকগুলি লোক শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার সম্মুখেই 'চরিত্রহীন' পুস্তক খানায় আগুন ধরাইয়া দিয়া তাহা ভস্মে পরিণত করিয়া দিল। শরৎচন্দ্র নীরবে বসিয়া বসিয়া এই সব কাণ্ড দেখিলেন।

যাইবার সময় সেই অভদ্র বিরুদ্ধবাদীর দল তাঁহাকে শাসাইয়া গেল,—আবার এই রকম বই লিখিলে তাহারা শরৎচন্দ্রকে ধরিয়া প্রহার করিবে, পাড়া ছাড়া করিয়া তবে ছাড়িবে, বাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দিবে। আরও কত কি! শরৎচন্দ্র স্তব্ধ হইয়া মনের আগুনে জ্বলিতে জ্বলিতে সমস্ত কথাই শুনিলেন, একটা কথাও বলিলেন না।

শরৎচন্দ্র বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি শিল্পী, আমি সাহিত্য-স্রষ্টা, সাহিত্যিকের কার্য্য সমাজের ও জাতির গলদ

প্রতিকারের জন্য চেষ্টা, তাহাই যদি করিতে না পারিলাম তবে আমার সাহিত্য সৃষ্টি কিসের? তবে আমার সবই যে ব্যর্থ হইবে। আমি যাহা সত্য, যাহা ধ্রুব, যাহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি তাহা করিবই। ইহাতে যতই কেন বিরুদ্ধ সমালোচনাই হউক না কেন, তাহাতে বিচলিত হইলে চলিবে না। আমাকে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতে হইবে।"

বিরুদ্ধ সমালোচকদের এইরূপ অভদ্রোচিত কাণ্ড দেখিয়া শরৎ-চন্দ্রের স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী আসিয়া ছল ছল চক্ষে দাঁড়াইলেন। শরৎচন্দ্র একটু হাসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "বড় বৌ, ওদের ওপর আমার রাগ বা অভিমান কিছুই নাই। ওরা যা করে না জেনে করে। আমি যা করি তা জেনেই করি। আমার অবলম্বন রয়েছে বুকে। নাম তার সত্য। কবি বলেছেন, ওদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বল,—'তোরে নাহি করি ভয়'। আমিও তাই বলি। কবির কথায় আমিও বলি,—

'তোর চেয়ে আমি সত্য এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ।
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক'।"

শরৎচন্দ্রও কোনও সমালোচনা বা বিরুদ্ধবাদিতাই গ্রাহ্য না করিয়া আপন ইচ্ছামত সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার 'দত্তা', 'শ্রীকান্ত (২য় পর্ব), 'ছবি', 'গৃহদাহ', 'বামুনের মেয়ে', 'দেনাপাওনা', 'নববিধান' এবং আরও অন্যান্য রচনা বাহির হইয়া গেল। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে তাঁহার গ্রন্থাবলীর ৫ম খণ্ডও ইহার মধ্যে বাহির হইয়া গিয়াছে।

ইতিমধ্যে শরৎচন্দ্র রূপনারায়ণ নদের তীরে সামতাবেড়ে নামক

স্থানে বহু অর্থব্যয়ে একখানি বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মাঝে মাঝে বাজে শিবপুর হইতে তিনি যাইয়া সেখানে বাস করেন। গ্রামের লোকদিগকে, বিশেষতঃ দরিদ্রদিগকে তিনি বড় ভালবাসিতেন, তাহাদের দারিদ্র্য, অভাব, অনটন, অসুখ বিসুখ, সব সময়েই শরৎচন্দ্রকে তাহাদের কাছে টানিয়া লইয়া যাইত। কাহারও কোনও প্রকার অভাব দেখিলেই তিনি তাহাদের মধ্যে যাইয়া পড়িতেন এবং তাহাদের অভাব দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য অর্থব্যয় করিতেন। তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশই ব্যয় হইত দরিদ্রের অভাব মোচনের জন্য। এই দরিদ্র-প্রীতি তাঁহার শৈশব হইতেই জননীর নিকট হইতে পাওয়া। দরিদ্র প্রতিবাসীরা ছিল যেন তাঁহার একান্ত আপনার জন।

শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ীটি ছিল বড়ই সুন্দর। শৈলেন্দ্রনাথ বিশী সেই বাড়ীখানি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"যখন দাদার (শরৎচন্দ্রের) বাড়ী এসে পৌঁছলাম, কি সুন্দর দৃশ্য! অশান্ত রূপনারায়ণ বয়ে চলেছে, তখন সে গতি মন্থর নয়, ভীষণ আবর্ত্তে, উল্কাবেগে। সময়টা ছিল ভাদ্রমাস। তার ওপর সকালের সোনালী রোদ প'ড়ে আলো ছায়ার কি বিচিত্র খেলা জলে ভেসে যাচ্ছে; নদীর বুকে পাল তুলে নৌকো সার বেঁধে চ'লেছে। দাদা বাইরেই পা'চারি করছিলেন, একেবারে গ্রামের পরিবেশে খাপ খাইয়েছেন; খড়ম পায়ে, খালি গা, হাতে থেলো হুঁকো।

"দাদা নিয়ে বসালেন বটতলায়, ঠিক তাঁর বাড়ীর সামনে, সেটা স্বামী বেদানন্দের সমাধি।...সেখানে বসে জিরিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ

করা গেল। বড় কম্পাউণ্ডের মধ্যে কুড়ি ইঞ্চি দেওয়ালের ওপর বোধহয় রাণীগঞ্জ টালির দোতলা বাড়ী।...

"দাদা নিজে ঘুরে ঘুরে বাড়ী দেখালেন, পুকুর, বাগান, চাঁপা, শিউলী ফুলের গাছ, রজনীগন্ধার ঝাড়। আমি ভারী খুসী হয়েছি দেখে দাদা বললেন,—এসব যে আমার হবে তা আমি কখনো ভাবতে পারিনি।

"দেখলাম, গ্রামের লোক দাদা ঠাকুর ব'লে ওঁকে খুব মানে, তাদের যুক্তি, বুদ্ধি, সল্লা, পরামর্শ দাদার কাছ থেকে নেয়। দেখলাম, গণজনের চেতনার সাথে আজও যোগ আছে তাঁর। এদের দুঃখ দরদ ইনি বোঝেন।"

চৌদ্দ

কেবল সাহিত্য সাধনাই যে এই সময় শরৎচন্দ্রের জীবনের ব্রত ছিল তাহা নহে, রাজনীতির সঙ্গেও তিনি এই সময় জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহিত শরৎচন্দ্রের প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইয়াছিল।

দেশবন্ধু তখন 'নারায়ণ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিতেন। তিনি শরৎচন্দ্রের লেখা পড়িয়া বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 'নারায়ণে' লেখা দেওয়ার জন্য তিনি শরৎচন্দ্রকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে থাকেন। তাঁহার অনুরোধে শরৎচন্দ্র নারায়ণের জন্য একটা গল্প পাঠাইয়া দেন। দেশবন্ধু লেখা পাইয়া তাঁহাকে লেখার পারিশ্রমিক স্বরূপ কত দিবেন স্থির করিতে না পারিয়া একখানা চেকে টাকার অঙ্ক বাদ রাখিয়া শুধু একখানা চেক দস্তখৎ করিয়া শরৎচন্দ্রকে পাঠাইয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে একখানা চিঠিও লিখিয়া দেন যে, টাকার অঙ্কটা আপনি নিজেই বসাইয়া লইবেন। সে জন্য কুণ্ঠাবোধ করিবেন না।

শরৎচন্দ্র চেকে নিজের ইচ্ছামত অঙ্ক বসাইয়া লইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই, লেখার পারিশ্রমিকের জন্য মাত্র তিনি একশত টাকা লইয়াছিলেন।

ইহার পর হইতেই দেশবন্ধুর সহিত শরৎচন্দ্রের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। এবং সেই বন্ধুত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শরৎচন্দ্র তাঁহারই উৎসাহ পাইয়া রাজনীতিতে যোগদান করেন।

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। শরৎচন্দ্র তখন কংগ্রেসে যোগদান করেন। হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির তিনি হইলেন সভাপতি। ইহার পর তিনি গঠনমূলক কার্য্যে যোগদান করেন। তিনি চরকায় সূতা কাটেন, আর সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কংগ্রেসের কাজ করিয়া বেড়ান। এই সময় সুভাষচন্দ্রের সহিতও শরৎচন্দ্রের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। শুধু সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে নহে, তখনকার বহু বিখ্যাত কংগ্রেস কর্ম্মীদের সহিতই তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল।

সুভাষচন্দ্র এইবার শরৎচন্দ্রকে বলিলেন, 'দাদা', এইবার আপনাকে জেলে যাইতেই হইবে।"

জেলে যাইতে শরৎচন্দ্রের কোনও ভয় বা আপত্তি নাই। প্রধান আপত্তি, তিনি আফিং খান, কিন্তু জেলে ত আর আফিং পাইবেন না, আফিং না খাইতে পাইলে তিনি যে মরিয়া যাইবেন।

সুভাষচন্দ্রকে বলিলেন,—"দেখ সুভায, জেলে যাইতে আমার কোনও আপত্তি নাই, কিন্তু জেলে গেলে যে আমার—"

সুভাষচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,—"চলুন না, ও ঠিক যোগাড় ক'রে দেবো।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন, "সে না হয় যত দিন তুমি আমার সঙ্গে থাকবে ততদিন। কিন্তু তারপর—? তুমি বেরিয়ে এলে কি হবে?"

শরৎচন্দ্র সুভাষচন্দ্রের কথা মত জুতার সুকতলার মধ্যে আফিং পুরিয়া নিয়া যাওয়ার কৌশল শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা মনঃপূত না হওয়ায় শরৎচন্দ্রের আর জেলে যাওয়া হইল না।

একদিন শরৎচন্দ্রের হস্তে একটা রিভলভার দেখা গেল। আসল বিলাতী রিভলভার,– 'কোলট্ রিভলভার'।

শরৎচন্দ্র বলিলেন,—"দেখছো কি! পাশ নেই—এ চোরাই মাল।"

শরৎচন্দ্র তখন গলাবন্ধ চীনা কোট পরিতেন, সেই কোটেরই চোরা-পকেটে থাকিত রিভলভার।

প্রায় পাঁচ বৎসর হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি থাকিয়া অবশেষে শরৎচন্দ্র ঐ পদ পরিত্যাগ করেন।

এই রাজনীতিতে যোগদানের জন্য তখন অনেকেই শরৎচন্দ্রকে বলিতেন,—"আপনি সাহিত্যিক, নোংরা রাজনীতিতে যোগ দেওয়া আপনার উচিত নহে।"

শরৎচন্দ্র হাসিয়া উত্তর করিতেন,—"রাজনীতি নোংরা জিনিস নয়। আমাদের এই পরাধীন দেশের সকলেরই রাজনীতিতে যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া আমি করি। এই আন্দোলন পরাধীনতা হইতে মুক্তির আন্দোলন, ইহাতে প্রত্যেক দেশবাসীর যোগ দেওয়া উচিত। বিশেষতঃ জাতি গঠন, সমাজ গঠন ও জনমত গঠনের গুরু দায়িত্ব যখন সাহিত্যিকদিগেরই প্রধান কর্ত্তব্য, তখন তাঁহাদেরই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য রাজনীতিতে যোগদান করা। যুগে যুগে দেশে দেশেত সাহিত্যিকেরাই দেশবাসীর হৃদয়ে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, মুক্তির অনুপ্রেরণা জাগাইয়া তুলেন।"

এই উদ্দেশ্য লইয়াই শরৎচন্দ্র তাঁহার সৃষ্ট সাহিতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন হিন্দু সমাজের কুসংস্কার, দরিদ্রের প্রতি নিপীড়ন, ধর্ম্মের হীনতা, নারীর প্রতি নিষ্ঠুর অবিচার ও অত্যাচার। অনেকের কিন্তু

শরৎচন্দ্রের এইরূপ চিরাচরিত রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা মোটেই ভাল লাগিল না। তাই তাহারা আরম্ভ করিল নীচতা আর শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে তিক্ত ও কঠোর সমালোচনা। কিন্তু তাহা শরৎচন্দ্রকে তাঁহার কর্ত্তব্যপথ হইতে বিন্দুমাত্রও টলাইতে পারে নাই।

শরৎচন্দ্র দেখিলেন, এক বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ব্যতীত বাংলা দেশে আর কোনও জাতীয়-সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই যাহা এই পরাধীনতা-নিপীড়িত মৃতপ্রায় জাতির হৃদয়ে দেশাত্মবোধের সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার করিতে পারে। দেশে এখন এই প্রকার দেশাত্ম-বোধক জাতীয়-সাহিত্য রচিত হওয়ার প্রয়োজন যাহা দেশবাসীকে স্বদেশ-প্রীতিতে উদ্বোধিত করিতে পারে।

এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া শরৎচন্দ্র লিখিলেন 'পথের দাবী'। বাজে শিবপুরের বাড়ীতে এই 'পথের দাবী' লেখা হয়। 'বঙ্গবাণী' নামক মাসিক পত্রে এই উপন্যাসখানি ক্রমাগত তিন বৎসর ধরিয়া ছাপা হইয়া অবশেষে শেষ হয়।

এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্স-এর স্বত্বাধিকারী সুধীরচন্দ্র সরকার পূর্ব্বেই এই 'পথের দাবীর' গ্রন্থস্বত্ব কিনিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু বই যখন শেষ হইল তখন তিনি এই বই প্রকাশ করিতে চাহিলেন না। তাঁহার ভয় হইল, এই বই প্রকাশ করিলে পুস্তকখানি হয়ত রাজদ্রোহের অপরাধে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে এবং আরও কত কি হইতে পারে।

একদিন সুধীর বাবু আসিয়া শরৎচন্দ্রকে ধরিলেন এবং বলিলেন, পথের দাবীর যে যে অংশ আইন অনুসারে আপত্তিকর বলিয়া মনে হইবে তাহা বাদ দিয়া দিতে হইবে। কথাটা শুনিয়া শরৎচন্দ্র রাগে

জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, তিনি 'পথের দাবীর' একটি অক্ষরও বাদ দিবেন না। সুধীর বাবু ক্ষুণ্ণ মনে চলিয়া গেলেন। তাঁহার আর 'পথের দাবী' প্রকাশ করা হইল না।

কোনও প্রকাশকই ভয়ে 'পথের দাবী' প্রকাশ করিতে সম্মত হইলেন না। শেষে স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'পথের দাবী' প্রকাশ করিলেন। পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়া মাত্র দেখিতে দেখিতে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সরকারের কোপ দৃষ্টিও বইখানার উপর পড়িল। সরকার পুস্তকখানি বাজেয়াপ্ত করিয়া দিলেন। ইহাতে সারা বাংলায় একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। বাঙ্গালী এই পুস্তকে খুঁজিয়া পাইয়াছিল তাহাদের বহু দিনের আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী,—তাহাদের মর্ম্মবাণী।

'পথের দাবী' সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইলেও সময়ে গোপনে গোপনে তাহা বিক্রয় হইত অতিশয় উচ্চ মূল্যে। এক একখানি পুস্তক ৫০৲ টাকা মূল্যে পর্য্যন্ত বিক্রীত হইত।

'শ্রীকান্ত' ৩য় পর্ব্ব বাহির হইয়া গেল। শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসই নাটকে রূপান্তরিত হইয়া বাংলার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে লাগিল। দর্শকমণ্ডলী সেই অভিনয় দর্শনে পরম পুলকিত ও মুগ্ধ হইল। শরৎচন্দ্রের নাটকগুলি এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল যে, তাহা নাট্য-জগতে এক নবযুগের সূচনা করিয়াছিল।

ইহার পর 'তরুণের বিদ্রোহ' এবং 'শেষপ্রশ্ন' প্রকাশিত হয়। 'শেষপ্রশ্ন' প্রকাশিত হইলে তাহা লইয়া বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। তাহারা আবার শরৎচন্দ্রের উপর আক্রমণ

চালাইতে লাগিল। সভাসমিতি করিয়া 'শেষপ্রশ্ন' সম্বন্ধে সমালোচনা ও তর্কাতর্কি আরম্ভ হইল। কতকগুলি কাগজে ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনাও প্রকাশিত হইল।

বড় বড় সাহিত্য-সম্মেলনে শরৎচন্দ্রকে সভাপতি হওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে প্রধান—মুন্সীগঞ্জ সাহিত্য-সম্মেলন, রংপুর যুব-সম্মেলন, কানপুর প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন। শিবপুরে, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে, টাউন হলে দেশবাসী সম্মিলিত হইয়া তাঁহার জন্মতিথি পালন করিল, তাঁহাকে মানপত্র ও অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিয়া শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিল।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জন্মদিনে বাণী পাঠাইলেন,—"এখনো তুমি দেশকে প্রতিদিন নব নব রচনা-বিস্ময়ে নব নব আনন্দ দান করবে এবং সেই উল্লাসে দেশ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ তোমার জয়ধ্বনি করতে থাকবে। পথে পথে পদে পদে তুমি পাবে সমাদর। পথের দুই পাশে যে সব নবীন ফুল ঋতুতে ঋতুতে ফুটে উঠবে তারা তোমার; অবশেষে দিনের পশ্চিমকালে সর্ব্বজন হস্তে রচিত হবে তোমার মুকুটের জন্য শেষ বরমাল্য। সেদিন বহুদূরে থাক্। আজ দেশের লোক তোমার পথের সঙ্গী, দিনে দিনে তারা তোমার কাছ থেকে পাথেয় দাবী করবে; তাদের সেই নিরন্তর প্রত্যাশা পূর্ণ করতে থাকো, পথের চরম প্রান্তবর্ত্তী আমি সেই কামনা করি। জনসাধারণ সম্মানের যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান ক'রে, তার মধ্যে সমাপ্তির শান্তিবাচন থাকে, তোমার পক্ষে সেটা সঙ্গত নয় একথা নিশ্চিত মনে রেখো।

"তোমার জন্মদিন উপলক্ষে 'কালের যাত্রা' নামক একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। আশা করি, এ দান তোমার অযোগ্য হয় নি।

"কালের রথ যাত্রার বাধা দূর করবার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর মুখে সার্থক হোক, এই আশীর্ব্বাদ সহ তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।"

শরৎচন্দ্রের একটা বড় দোষ ছিল। তিনি ছিলেন বড় লাজুক, মুখ-চোরা মানুষ। যে লোক তাঁহার লেখার দ্বারা মানুষের চিত্তকে এমন ভাবে মুগ্ধ ও জয় করিতে পারিতেন, তিনি সভাসমিতিতে দাঁড়াইয়া ভিড়ের মধ্যে সাজাইয়া গুছাইয়া মোটেই কথা বলিতে পারিতেন না। এই জন্য তিনি অনেক সভাসমিতিতে যাইতেই রাজি হইতেন না। লোকে সভাসমিতি করিয়া তাঁহার জয় ঢাক পিটুক, ইহা তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। এই জন্য অনেক সময় দেখা যাইত, তিনি কথা দিয়াও ইচ্ছা করিয়াই সভাসমিতিতে না যাইয়া আত্মগোপন করিয়া থাকিতেন।

পনর

এই সময় শরৎচন্দ্র বেশীর ভাগ সময়ই সামতাবেড়ের বাড়ীতে থাকিতেন। পল্লীগ্রামের আবহাওয়া, দৃশ্য, পারি-পার্শ্বিক অবস্থাই তাঁহার বেশী ভাল লাগিত। সামতাবেড়ের বাড়ীতে তিনি তিনটা বড় বড় পুকুর কাটাইয়া ছিলেন। তাহাতে বছর বছর মাছ ছাড়িতেন। শৈশবের মাছ ধরার অভ্যাস তিনি বৃদ্ধ বয়সেও ছাড়িতে পারেন নাই। তাই অনেক সময় তিনি পুকুরঘাটে বসিয়া ছিপ দিয়া মাছ ধরিতেন।

পল্লীগ্রামের জন্য ও পল্লীর প্রতিবাসীদের জন্য শরৎচন্দ্রের দরদ ছিল অত্যন্ত বেশী। কিসে তাহাদের কল্যাণ হইবে, কিসে তাহারা সুখে শান্তিতে থাকিবে, ইহাই ছিল তাঁহার প্রধান চিন্তা। গ্রামের পথঘাট সারাইয়া দেওয়া, মরা পুকুর কাটাইয়া দেওয়া, মেয়েদের জন্য স্কুল করা,—যখনই গ্রামের উন্নতির জন্য যাহা আবশ্যক হইয়াছে শরৎচন্দ্র আপনা হইতেই তাহা করিয়া দিয়াছেন। পল্লীবাসীদের চিকিৎসার ভাল বন্দোবস্ত নাই দেখিয়া শরৎচন্দ্র নিজে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করিয়াছিলেন। কাহারও অসুখ করিয়াছে সংবাদ পাইলেই নিজে যাইয়া ঔষধ দিতেন।

শরৎচন্দ্রের নিজের কোনও সন্তান সন্ততি ছিল না। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্রের পুত্র অমলচন্দ্র এবং কন্যা মুকুলমালাই ছিল তাঁহার বড় আদরের ধন। তাহাদিগকে শরৎচন্দ্র যে ভাবে স্নেহ আদর করিতেন, সাধারণতঃ লোকে আপন পুত্রকন্যাদিগকেও সেরূপ করে না।

শরৎচন্দ্রের স্বাস্থ্য খারাপের জন্য তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টিতে কিছু

বাধা পড়িতেছিল। ১৯৩১ সাল হইতে ১৯৩৪ সাল এই তিন বৎসরের মধ্যে তুইখানা বই প্রকাশিত হইয়াছিল,—শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব্ব এবং অনুরাধা।

১৯৩৪ সালে শরৎচন্দ্র পত্নী হিরণ্ময়ী দেবীর আগ্রহে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া কলিকাতার অশ্বিনী দত্ত রোডে একখানি বাড়ী করিলেন। পরে একখানি মোটর গাড়ীও কিনিয়াছিলেন।

১৯৩৫ সালে 'বিপ্রদাস' প্রকাশের বৎসরই শরৎচন্দ্রের শরীর আরও খারাপ হইয়া পড়িল।

১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার জন্য ডি-লিট উপাধি দান করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁহাকে জগত্তারিণী পদক প্রদান করিয়াছিলেন।

১৯৩৭ সাল। একদিন সামতাবেড়ে হইতে এক ক্রোশ পথ হাঁটিয়া আসিতে শরৎচন্দ্রের সর্দ্দিগর্ম্মীর মতন হইল। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। ক্রমে জ্বর আরম্ভ হইল। জ্বর আর ছাড়ে না। শরৎচন্দ্র দিন দিন তুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ডাক্তারেরা অবশেষে বলিলেন, "বি-কোলাই" হইয়াছে।

রোগটা খারাপ। ডাক্তারেরা শরৎচন্দ্রকে হাওয়া বদলাইতে কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র কিছুতেই যাইতে সম্মত নহেন।

বন্ধুদিগের অত্যন্ত অনুরোধ এবং পীড়াপীড়িতে শেষ পর্য্যন্ত শরৎচন্দ্র দেওঘরে যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

দেওঘরে একমাস থাকিয়া শরৎচন্দ্র আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের শরীর সারে নাই। শরৎচন্দ্র চাদরটা গায়ে জড়াইয়া বিছানায় শুইয়া খোলা জানালা দিয়া কত কথাই ভাবেন। মনে পড়ে তাঁহার দেবানন্দপুরের শৈশব জীবনের কথা, পেয়ারী পণ্ডিত ও তাঁহার পাঠশালা, পাঠশালা পলায়ন, নয়ন দা, রাত্রে গোপনে নৌকায় চড়িয়া মাছ ধরিতে যাওয়া,—এমনি কত কি ?

ডাঃ বিধানচন্দ্র শরৎচন্দ্রকে দেখিতে আসিলেন। রোগ ধরা পড়িল,—কিঙ্ক-কিঙ্কুস হইয়াছে,—অন্ত্রের অবরোধ।

এক্স্-রে করা হইল। ধরা পড়িল, শরৎচন্দ্রের যকৃতে ক্যান্সার হইয়াছে ;—তাহা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে পাকস্থলীতে।

ডাক্তারেরা বলিলেন,—"আশা নাই।"

ডাক্তার ম্যাকে বলিলেন,—"অপারেশন করিয়া হয়ত রোগীকে আরও কিছুদিন বাঁচাইয়া রাখিতে পারা যাইবে। তাহা করিতে হইলে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া নার্সিং হোমে লইয়া যাওয়া উচিত।"

সেই দিনই শরৎচন্দ্রকে লইয়া যাওয়া হইল একটা বিলাতী নার্সিং হোমে।

শরৎচন্দ্রের শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল। ডাক্তারেরা বলিলেন,—"এই দুর্ব্বল শরীরে অপারেশনের দায়িত্ব তাঁহারা লইতে পারেন না।"

শরৎচন্দ্র ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"আমার জীবনের দায়িত্ব ডাক্তারদের নিতে হবে না, তা আমি নিজেই নিচ্ছি।"

ডাক্তারেরা এইবার অস্ত্রোপচারে স্বীকৃত হইলেন।

রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে পত্র লিখিলেন,—"সমগ্র বঙ্গদেশ তোমার নিরাময় সংবাদ শুনিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে।"

অপারেশন শেষ হইয়াছে। রবারের নল দিয়া তরল খাদ্য দেওয়া হইতেছে। কিন্তু তাহাতে কাজ কিছুই হইতেছে না। শরীরে রক্ত নাই, রক্ত দিতে হইবে।

শরৎচন্দ্রের ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্র রক্ত দিতে লাগিলেন। অবস্থার যেন একটু পরিবর্ত্তন ঘটিল। শরৎচন্দ্র চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন।

অপারেশনের পর তিন দিন কাটিয়া গেল। অপারেশন হইয়াছিল বুধবার। এই কয়দিন শরৎচন্দ্র কোনও প্রকার চীৎকার করেন নাই। কিন্তু শনিবার রাত্রি হইতে তাঁহার কাতর আর্ত্তনাদে নার্সিং হোমের বাতাস কাঁপিয়া উঠিল। শরৎচন্দ্রের দুঃসহ যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়াছে।

শনিবার রাত্রিটা ভয়ানক উদ্বেগের মধ্য দিয়া কোনও প্রকারে কাটিয়া গেল। রবিবার আসিল। শরৎচন্দ্রের কণ্ঠ তখন নীরব হইয়া গিয়াছে, কিন্তু হৃদয়ের স্পন্দন তখনও থামে নাই।

বিধানচন্দ্র আসিলেন। সঙ্গে আরও কত বড় বড় ডাক্তার। শরৎচন্দ্রকে অক্সিজেন দেওয়া হইতে লাগিল। নার্সিং হোম আত্মীয় স্বজনের ও সাধারণ লোকের ভিড়ে পূর্ণ হইয়া গেল। সকলের মুখেই এক কথা,—"আমাদের শরৎচন্দ্র এখন কেমন আছেন?"

বেলা দশটা।

ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় বিষণ্ণ মুখে কেবিন হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। জনতা তাঁহার মুখে শুনিতে পাইল, তাহাদের বড় প্রিয় শরৎচন্দ্র পৃথিবীর মায়া কাটাইয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

জনতা মুহূর্ত্ত মধ্যে স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহাদের হৃদয় মথিত করিয়া হাহাকার উঠিল, নয়নে অশ্রুধারা বহিল।

২রা মাঘ, ১৯৩৮ সাল, রবিবার পৌষ পূর্ণিমার সকালে বাংলার চিরপ্রিয় দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র অমর লোকে প্রস্থান করিলেন।

শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট অমর সাহিত্য চির অমর হইয়া বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে বর্ত্তমান রহিল। যতদিন বাংলা সাহিত্য থাকিবে ততদিন বাংলার পাঠক শরৎ-সাহিত্য পরম শ্রদ্ধা ও আদরের সহিত পাঠ করিবে।

সমাপ্ত

